বাংলা বানান

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রকাশ : পঁচিশে বৈশাখ ১৩৫৮

প্রকাশক : লীলা ভট্টাচার্য, আশা প্রকাশনী, ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯
মুদ্রক : দিলীপ দে, দে প্রিন্টার্স, ১৫৭ বি মসজিদবাড়ি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদশিল্পী : অজয় গুপ্ত

ওঁ

পূজ্যপাদ

আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন

আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

যে-ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে।

—রবীন্দ্রনাথ

যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্ব্বদাই লিখতে হচ্চে সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নূতন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক।

—রবীন্দ্রনাথ

॥ শ্রী ॥

আভাষ

মাসিকপত্র প্রকাশ করতে হলে সব সময়ে নির্দিষ্ট মানের প্রবন্ধ-সংগ্রহ সম্ভবপর হয় না। সম্পাদকেরা হাতের কাছে যাকে পান তার কাছেই লেখা চেয়ে বসেন এবং গুণাগুণ বিচার না করেই প্রাপ্ত প্রবন্ধ দিয়ে পৃষ্ঠা ভরাট করেন। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রায় সবগুলি প্রবন্ধেরই জন্ম-ইতিহাস এই।

এইসব লেখা একত্র গ্রথিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাবে এমন কল্পনা কোন কালেই লেখকের মনে আসে নি। শ্রীযুক্ত সুবীর ভট্টাচার্যের আগ্রহে বানান-ব্যাকরণ-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু মূলতঃ এক, ফলে একই কথা একই ভাষায় বার-বার বলা হয়েছে। পুনরুক্তি বর্জন করে লেখাগুলি প্রকাশ করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সে-ক্ষমতা লেখকের আজ নেই। লেখকের বয়স আশী পেরিয়ে গেছে—দৃষ্টিশক্তি, চলনশক্তি নেই বললেই চলে, ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। তথাপি গ্রন্থমধ্যে নূতন করে লিখে দুটি প্রবন্ধ দিতে হল। পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সবই সমস্যামূলক—বানান-ব্যাকরণ-বিষয়ে লেখকের মনে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা এসেছে, তারই কিছু কিছু সুধীবর্গের গোচরে আনা হয়েছে মাত্র। বিতর্কিত বিষয়ে লেখকের যে-মতামত প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিকে সমস্যার সমাধান বলার মতো ধৃষ্টতা লেখকের নেই—সমাধান দিতে পারেন বিদগ্ধ বিবুধমণ্ডলী। কিন্তু পুস্তকের নামে কিংবা প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যদি এই পুস্তক কিনে

ফেলেন তাঁদের আশাভঙ্গ হতে পারে। তাই প্রয়োজনবোধে, অসতর্ক লেখকদের রচনায় সচরাচর যেসব ভ্রমপ্রমাদ দেখা যায় সেগুলিরই কিছু কিছু উল্লেখ করে এবং শতবর্ষযাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে-রীতিতে বাঙ্গালী হিন্দু নামের বর্ণান্তর করছেন তারই কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে তরুণদের উদ্দেশে দুটি রচনা জুড়ে দিলাম।

বানানবিচার-প্রসঙ্গে লেখকের কিছু বক্তব্য আছে। এযুগের এক শ্রেণীর পণ্ডিত বানান-সংস্কার বলতে বর্ণ-সংস্কার বোঝেন। বলা বাহুল্য, 'বানান'- অর্থাৎ 'বর্ণবিন্যাস'-সংস্কার আর 'বর্ণ'-সংস্কার এক কথা নয়। এঁরা যে ঠিক বর্ণ-'সংস্কার' চান তা-ও নয়, এঁরা চান বর্ণ-'সংহার'। আমরা আলোচনা করেছি বর্তমান বাংলা ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি, ভবিষ্যতে যে-ভাষা হবে বা এই সংস্কারকদের মতে 'বর্ণ বর্জন করে যা হওয়া উচিত', সে-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি নি। হ্রস্ব-দীর্ঘ, দন্ত্য-মূর্ধন্য, বর্গ্য-অন্তঃস্থ'র ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে, বর্ণ ছাঁটাই করে নূতন করে যে-ভাষার সৃষ্টি হবে, সে-ভাষা আর যা-ই হোক বর্তমান বাংলা ভাষা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাংলা নয়। অতএব সে-ভাষার শুদ্ধি-অশুদ্ধির জন্য আমরা ব্যস্ত হই নি। নূতন ভাষায় অন্য দোষ-গুণ যা-ই দেখা দিক, বর্ণাশুদ্ধির প্রশ্নই উঠতে পারবে না—বর্ণবাহুল্যরোধই যখন মূল লক্ষ্য। সম্প্রতি-প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অনবদ্য বানানের প্রস্তাবিত রূপ দেখলাম—ক্‌রিপা (কৃপা), গ্‌রিহ (গৃহ), ঘ্‌রিত (ঘৃত), ভ্‌রিগু (ভৃগু)। ধ্বনিবিজ্ঞানীরা কী বলেন? বৃথাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের 'আব্রিত্তি' শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেন। হস্‌-বর্জনকারীদের মতই বা কী?

এযুগের অধিকাংশ সাহিত্যিক ধ্বন্যাত্মক বানানের দিকে ঝুঁকেছেন। ধ্বন্যাত্মক বানান বাংলা ভাষায় সম্ভবপর বলে আমরা ভাবতেই পারি না—কিছু কিছু তৎসম শব্দের বানান বিকৃত করা যেতে পারে মাত্র। 'অ' বর্ণেরই ধ্বনি বাংলায় কি মাত্র তিনরকম?

'তৎসম' শব্দটা নিয়েও তর্ক উঠেছে। বৈয়াকরণেরা আক্ষরিক

অর্থে কথাটি ব্যবহার করেন না। শব্দটা যোগরূঢ়। পরিভাষা সচরাচর যোগরূঢ় শব্দই হয়ে থাকে। সংস্কৃত যেসব শব্দের বানান বাংলা ভাষায় বিকৃত হয় নি, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'তৎসম'। সংস্কৃত 'জল' শব্দের দুটি 'অ'-বর্ণই বাংলা উচ্চারণে বিকৃত, কিন্তু বানানে কোন বিকৃতি নেই। 'জল' শব্দকে 'তৎসম' বলা হয়েছে। ইংরেজী 'Pen' শব্দের বাংলায় উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটে নি, কিন্তু 'পেন' শব্দকে 'তৎসম' বলা হয় না।

মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে বইখানিকে রক্ষা করা গেল না। এজন্য পাঠকের ধিক্কার মাথা পেতেই নিতে হচ্ছে। লেখকের দৃষ্টিক্ষীণতাই ছাপায় ভুলের একমাত্র কারণ নয়, মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে প্রুফ দেখার ক্ষমতাও লেখকের নেই। বানান-বিষয়ক বই, অতএব বানানে সংশয় আসতে পারে এমন যে-ক'টি ভুল চোখে পড়ল, সেগুলির একটা তালিকা গ্রন্থের পুরোভাগেই দেওয়া গেল; সর্ববিধ প্রমাদ স্থানান্তরে সংশোধন সহজসাধ্য নয়, সে-প্রয়াসও হাস্যকর মনে হতে পারে—সহৃদয় পাঠক ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জনা করে নেবেন। ইতি—

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রকাশকের নিবেদন

কবিপক্ষে 'বাংলা বানান' প্রকাশিত হল। পরিকল্পনা ছিল গত মহালয়ার দিন বইটি প্রকাশ করবার। কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তির ফলে এই বিলম্ব।

এই গ্রন্থে লেখক রাজশেখর বসু পরিকল্পিত এবং রবীন্দ্রনাথ সমর্থিত একটি নূতন বর্ণ এবং তার যোজ্য-চিহ্ন প্রচলনের প্রস্তাব দিয়েছেন। এই নূতন বর্ণ ও তার যোজ্য-চিহ্নের জন্য দুটি নূতন টাইপ তৈরি করতে হয়েছে। টাইপ-দুটি নিখুঁত না হওয়ায় বই-এ যে ত্রুটি থেকে গেল, তার দায়িত্ব আমাদের। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এই নূতন টাইপ প্রচলন-সম্বন্ধে চিন্তা করবেন।

একটি ব্লক ব্যবহার করতে দিয়ে 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। টাইপ-দুটি তৈরির কাজে শ্রীসরস্বতী প্রেসের কর্মী শ্রীপ্রদ্যোত সাহা এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস এবং অন্যভাবে সহযোগিতার জন্যে শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়দের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা বানান নিয়ে এই বইটি পণ্ডিতমহলে আলোড়ন তুলবে এবং আশা করি তার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে।

বিনীত

প্রকাশক

সূচী

মুদ্রণ-প্রমাদ

পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	১১,১২	বিশি	বিশী
২৮	শেষ	ননা	নানা
৩১	শেষ	পালিপিইণ্ডু	পাণ্ডুলিপিই
৩৬	১৩	ষথা	যথা
৫৫	১১	বংশবদ	বশংবদ
৭১	২৪	নাচৈঃ	নীচৈঃ
১০২	২৬	পদ ন্তে	পদান্তে
১০৯	১৮	যাদুঘর,	যাদুঘর’
১১৭	২৩	ব্যকরণসম্মত	ব্যাকরণসম্মত

বানান-বিচার

বাংলা বানান

[সূচনায় একটি ব্যক্তিগত কথা বলে রাখি। এই প্রবন্ধে কয়েকজন সাহিত্যিক ও অধ্যাপকের নাম করা হয়েছে। এঁরা সকলেই প্রবন্ধ-লেখকের শ্রদ্ধাভাজন। যাঁদের সঙ্গে লেখকের মতানৈক্য দেখা যাবে তাঁরা অনেকেই কেবল শ্রদ্ধাভাজন নন, ভক্তিভাজন। আচার্য্য সুনীতিকুমারের প্রতি লেখকের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। বহুকাল যাবৎ নানা ভাবে লেখক তাঁর কাছে ঋণী। আর রবীন্দ্রনাথ! তাঁরই জীবন ও রচনা থেকে আহৃত মন্ত্র লেখককে সুদীর্ঘকাল সুখে দুঃখে সঞ্জীবিত রেখেছে।]

পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছর পূর্বের কথা। বৈঠকী আলাপে একদিন আচার্য (আচার্য্য ?) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন, "আমার দুটো সাধ আছে। আমার বয়স যখন পঞ্চাশ হবে, এম্. এ. ক্লাসের ছাত্রদের 'তুমি' বলব আর 'যাওয়া' লিখতে বর্গ্য-জ লাগাব।" আমি বললাম, "ছাত্রদের 'তুমি' বলবার জন্যে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, কিন্তু 'যাওয়া'তে বর্গ্য-জ লাগাতে হলে আজই তা করুন, পঞ্চাশ বছর বয়সে তা পারবেন না।" সুনীতিকুমার এম্. এ. ক্লাসের ছাত্রদের 'তুমি' সম্বোধন হয়তো করে থাকবেন, কিন্তু আজ ছিয়াশী বছর বয়সেও 'যাওয়া' শব্দে বর্গ্য-জ প্রয়োগ করতে পারলেন না। তবে সে-কথা পরে। বর্গ্য-জ অন্তঃস্থ-য, দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ, হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ প্রভৃতি প্রসঙ্গ পরে তুলছি। সর্বাগ্রে 'আচার্য' কি 'আচার্য্য' এই আলোচনায় আসি।

এই লেখা যদি সুনীতিকুমারের চোখে পড়ে তিনি 'আচার্য' বানান দেখলে বিরক্ত হবেন, কারণ বানানটি ভুল, শুদ্ধ বানান 'আচার্য্য'।

সুনীতিকুমারের এই মত, আমাদেরও এই মত। তবু কেন 'আচার্য' লিখছি তার কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার।

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতি'র প্রথম সংস্কারই হল 'রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-বর্জন'। সংস্কার-সমিতির প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের মে মাসে। এই পুস্তিকায় প্রথম নিয়মটিই ছিল "সংস্কৃত শব্দে যদি ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে ; যথা—কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক ইত্যাদি। অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না ; যথা—অর্জুন, কর্ম, সর্ব, সূর্য ইত্যাদি।"

সংস্কার-সমিতির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ঐ বছরই অক্টোবরে। এবারে উক্ত বিধানের ব্যতিক্রমটিও তুলে দেওয়া হল। বলা হল "রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না ; যথা—অর্চনা, মূর্ছা, কার্তিক, অর্ধ, কার্য, সর্ব।" এই পুস্তিকার গোড়াতেই দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে লেখা কয়েকটি লাইন—"বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬"। নীচে আরও একটি স্বাক্ষর আছে—"শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১লা আশ্বিন, ১৩৪৩"। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণই শেষ সংস্করণ নয়। তৃতীয় সংস্করণ বেরুল ১৯৩৭-এর জুন মাসে। এবারও কোন ক্ষেত্রেই রেফের পর দ্বিত্ব আর ফিরে এল না।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ এইসমস্ত নিয়মের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুললেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছু অম্ল-কটু ভাষাতেই পত্র-ব্যবহার শুরু করলেন, যদিও উপসংহারে প্রণাম জানাতেন এবং নিজ নামের পূর্বে 'প্রণত' লিখতেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গিমায় একরকম দ্বৈরথযুদ্ধেই অবতীর্ণ হলেন। তিনি লিখলেন, "রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-বর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা নিয়ে বেশি তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করি নে। যাঁরা নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের

মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতের নাম দেখেছি। …এখন থেকে 'কার্ত্তিক' 'কর্ত্তা' প্রভৃতি দুই-ত-ওয়ালা শব্দ থেকে এক 'ত' আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেদন করে নিতে পারি, সেটা সাংঘাতিক হবে না। হাতের লেখায় অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না—কিন্তু ছাপার অক্ষরে পারব। এখন থেকে 'ভট্টাচার্য্য' শব্দের থেকে য-ফলা লোপ করতে নির্ব্বিকারচিত্তে নির্ম্মম হতে পারব কারণ নব্য বানান-বিধাতাদের মধ্যে দু'জন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্যবংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আর্য্য এবং অনার্য্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা মোচন করতে পারবেন যেমন আধুনিক মাঞ্চু এবং চীনা উভয়েরই বেণী গেছে কাটা।"

বানান-সংস্কার-সমিতিতে অন্যতম সদস্য ছিলেন আচার্য সুনীতি-কুমার। শুধু অন্যতম সদস্য নন, সুনীতিকুমার ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সদস্য। সুনীতিকুমারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ, শ্রদ্ধা, নির্ভর ছিল অপরিসীম। তখন যদি সুনীতিকুমার বলতেন 'আচার্য' বানান যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ ঐ শব্দের বাংলা উচ্চারণ 'আচার্জ্য' (আঁচার্জ নয়), সমিতি এটিকে নিয়মের ব্যতিক্রম পর্যায়েই রেখে দিতেন। রবীন্দ্রনাথেরও দেবপ্রসাদবাবুর সঙ্গে এই অসম লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হতে হত না। বানান-সমিতি কিন্তু অনবধানে 'র্য' বিধান দেন নি। বিচার-বিশ্লেষণ করেই দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে সমিতির বক্তব্য তুলে ধরছি—

"অনেকে 'কার্য্য' শব্দের উচ্চারণ 'কাইর্জ' তুল্য করিয়া থাকেন; 'কার্য' লিখিলে 'কার্জ' উচ্চারণের আশঙ্কা আছে। 'কাইর্জ' বা 'কার্জ' কোন্ উচ্চারণ ভাল তাহার বিচার অনাবশ্যক। যাঁহারা 'কাইর্জ' উচ্চারণ করিয়া থাকেন, য-ফলা বাদ দিয়া 'কার্য' লিখিলেও তাঁহারা অভীষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিবেন।"

আজ সুনীতিকুমার 'র্য' বানানের প্রতি বিরূপ, কিন্তু তাঁরই প্রিয় ছাত্র ও সহকর্মী বন্ধু প্রবীণ ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার

ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সর্বত্র বানান দিচ্ছেন 'আর্য, সূর্য'; বানান-সংস্কার-সমিতির সভাপতি রাজশেখর বসু তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধানে বানান দিচ্ছেন 'আর্য, সূর্য'; বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের বানান সর্বত্র 'আর্য, সূর্য'; বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত 'ভারতকোষ' গ্রন্থে (যার সম্পাদকমণ্ডলীতে আছেন স্বয়ং সুনীতিকুমার এবং সুশীলকুমার দে, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ) বানান দেখছি 'আর্য, সূর্য'। এরূপ ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই আমাদের মতো সাধারণ লোকের 'আচার্য' বানান মেনে নিতে হয়। পুনরায় বানান-সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত এই ভুল বানান চলতেই থাকবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সংস্কার-সমিতির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর এই প্রবন্ধের লেখক সাক্ষাৎ করেছিল সমিতির সভাপতি রাজশেখর বসুর সঙ্গে। সসঙ্কোচে রাজশেখর বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কার্ত্তিক শব্দ যখন কৃত্তিকা শব্দ-জাত তখন 'কার্তিক' বানান কি যুক্তিসঙ্গত?" রাজশেখর বাবু কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করেই বললেন, "মশাই, সংস্কারই করলাম একটা। আপনারা ইস্কুলমাস্টাররা কিছুই করতে দেবেন না! 'কার্তিক' শব্দ সংস্কৃত অভিধানে আছে। ছেলেরা 'কার্ত্তিক' লিখলে কেটে দেবেন, শূন্য দেবেন, 'কার্তিক'ই একমাত্র বানান।" আমি আর উচ্চবাচ্য করলাম না, মনের ভাব মনেই চাপা থাকল—ছয় মাস আগেও অর্থাৎ সমিতির প্রথম পুস্তিকায় 'কার্ত্তিক' বানানই ছিল বিহিত, এখন শিশুদের পক্ষেও এই বানান অমার্জনীয়! আরও একটা কথা মনে হল—তৎসম শব্দের বানান সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন সংস্কার-সমিতির প্রয়োজন তৎকালে অনুভূত হয় নি, সমিতি স্থাপন করা হয়েছিল 'প্রাকৃত বাংলা'র বানান সংযত করার জন্য। অর্থাৎ সমিতির এই সংস্কার অনেকেই মনে করেছিলেন অধিকার-বহির্ভূত।

বানান-সংস্কার-সমিতি কেন গঠিত হয়েছিল এবং সমিতিকে বিশেষ

কোন্ ভার অর্পণ করা হয়েছিল তা নিম্নলিখিত পত্রাংশগুলি পড়ে দেখলেই বেশ বোঝা যাবে।

১৩৩৮ সালের ১৯ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের লেখককে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন :

"চলতি বাংলার বানান সম্বন্ধে প্রশান্ত বিধান নিয়েছিলেন সুনীতির কাছ থেকে। নিয়মগুলো মনে রাখতে পারি নে, অন্যমনস্ক হয়ে হাজারবার লঙ্ঘন করি। সেইজন্যে অসঙ্গতি সর্ব্বদাই দেখা যায়।

যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্ব্বদাই লিখতে হচ্চে সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নূতন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক—আমাদের মনটা অত্যন্ত সাবেককেলে বলে শীঘ্র এর কোনো কিনারা হবে বলে বোধ হয় না।

প্রাকৃত বাংলার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেড়ে চলেচে কিন্তু ভাষার এই যুগান্তরের সময় হাওয়াটা এলোমেলে ভাবেই বইবে। এ সময়কার কর্ণধারের কাজ সুনীতির নেওয়া উচিত—আমার বয়স হয়ে গেছে।

প্রাকৃত বানানের বিধিবিধান মনে রেখে প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব বলেই অন্যদের হাতে সে ভার পড়েচে—সেই অন্যরাও নানাবিধ মানুষের মধ্যে বিভক্ত। সেই কারণেই উচ্ছৃঙ্খলতার অন্ত নেই।"

১৯৩৭-এর ১২ জুন রবীন্দ্রনাথ দেবপ্রসাদবাবুকে যে-চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে আছে :

"বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম। তার কারণ এই যে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর বানান সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল

হয়ে উঠ্‌চে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম। এ সম্বন্ধে আমার আচরণেও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় সে আমি জানি, এবং তার জন্যে আমি প্রশ্রয় দাবি করি নে। এ রকম অব্যবস্থা দূর করার একমাত্র উপায় শিক্ষাবিভাগের প্রধান নিয়ন্তাদের হাতে বানান সম্বন্ধে চরম শাসনের ভার সমর্পণ করা।"

১৯৩৭-এর ২৯ জুন রবীন্দ্রনাথ দেবপ্রসাদবাবুকে লিখছেন :

"কিন্তু যে-প্রস্তাবটি ছিল বানান-সমিতি স্থাপনের মূলে সেটা প্রধানত তৎসম শব্দ সম্পর্কীয় নয়। প্রাকৃত বাংলা যখন থেকেই সাহিত্যে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করল তখন থেকেই তার বানানসাম্য নির্দিষ্ট করে দেবার সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই—যাঁরা সতর্ক হতে চান হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান রাখলেই বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি, কেননা আজো তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি। কিন্তু এই বানানের ভিৎ পাকা করার কাজ শুরু করবার সময় এসেছে। এতদিন এই নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি। তখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রাধান্য লাভ করে নি। এই কারণে সুনীতিকেই এই ভার নেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেম। তিনি মোটামুটি একটা আইনের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয়, পুলিসেরও জোর। সেইজন্যে তিনি দ্বিধা ঘোচাতে পারলেন না। এমনকি, আমার নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্বের মতোই চলল। আমার সংস্কার, প্রুফশোধকের সংস্কার, কাপিকারকের সংস্কার, কম্পোজিটরের সংস্কার, এবং যেসব পত্রিকায় লেখা পাঠানো যেত তার সম্পাদকদের সংস্কার

এইসব মিলে পাঁচ ভূতের কীর্তন চলত। উপরওয়ালা যদি কেউ থাকেন এবং তিনিই যদি নিয়ামক হন, এবং দণ্ড পুরস্কারের দ্বারা তাঁর নিয়ন্তৃত্ব যদি বল পায় তা হলেই বানানের রাজ্যে একটা শৃঙ্খলা হতে পারে।"

'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার ভূমিকায় (৮ মে ১৯৩৬) ভাইশ্-চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখলেন:

"বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত ভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যেসকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ, তাহাদের বানানে বহু স্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র—সকলকেই কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাংলা বানানের একটা বহুজনগ্রাহ্য নিয়ম দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাংলা ভাষার লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের সকলের বানানের রীতিও এক নহে। সুতরাং মহাজন-অনুসৃত পন্থা কোন্‌টি তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই।

কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া হয়—যেসকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সেসকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা। প্রায় দুইশত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া

সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন।···কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্য-পুস্তকাদিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলীসম্মত বানান গৃহীত হইবে। আবশ্যক হইলে ইহা সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতে পারিবে।"

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকার যে-কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হল এতেই স্পষ্ট বোঝা যাবে প্রাকৃত বাংলার অর্থাৎ তদ্ভব, ভগ্নতৎসম, অজ্ঞাতমূল ও বিদেশী শব্দের বানানে সামঞ্জস্য আনবার জন্যই বানান-সংস্কার-সমিতি গঠিত হয়েছিল। তৎসম শব্দের বিকৃতি খুব একটা ছিল না। সামান্য কিছু অবশ্য ছিল, সে-সম্বন্ধে বিধান পাওয়া গেলে তৎসম শব্দের বানানে তেমন অরাজকতা দেখা দিত না। কিন্তু 'প্রাকৃত' বাংলায়, বিশেষভাবে ক্রিয়াপদগুলিতে, উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল ভয়াবহ। এই শব্দগুলির বানানে সামঞ্জস্য-বিধান অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন, সে-সময়ে এই বানান-সংস্কারের ক্ষমতা একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছিল, কারণ অধ্যাপক, শিক্ষক এবং ছাত্ররা যদি একটা বিশেষ নিয়মে চলেন, তবে সাহিত্যিকেরা সেই বানান গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, যদি রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্য-গুরুও সেই বিধানগুলি নির্বিচারে মেনে নেন। এই জন্যই স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ বিচার-বিবেচনা না করেই বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বানানপদ্ধতি অনুসরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু সংস্কার-সমিতি সর্বাগ্রেই আক্রমণ করলেন এমন এক স্থানে যেখানে বাংলা ভাষায় কোনকালে কোনরকম উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। এই সংস্কারটি হল সর্ববিধ রেফাক্রান্ত শব্দে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জিত হবে। এ স্থলে সংস্কৃতে বিকল্প বিধান আছে এবং দু'একজন সংস্কারক পণ্ডিত ছাড়া সকলেই রেফযুক্ত বাংলা শব্দে সর্বত্র দ্বিত্ব প্রয়োগ করতেন। এই সংস্কারটি না হলে সেকালে বানান-সংস্কার-সমিতির বিরুদ্ধে এতটা প্রবল আন্দোলন হত না। অসংখ্য লেখক (তন্মধ্যে

একজন ছিলেন সুনীতিকুমারেরই বৃদ্ধ পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়), প্রায় সমস্ত ইংরেজী বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রের সম্পাদক, এমনকি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ধীরবুদ্ধি রবীন্দ্রানুরাগী মনীষীও এই নিয়মের উপর এমন বিরূপ হলেন যে তৎকালীন বাংলা সরকার এবং খোদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বলতে বাধ্য হলেন যে এই বানান-বিধি অবশ্য-পালনীয় নয়।

রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জন সম্বন্ধে আজ অনুকূল বা প্রতিকূল কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তৎকালের মনীষীরা এই বানান-সংস্কারে যতটাই বাধা দিয়ে থাকুন না কেন, আজ এই বানান একরকম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। দু'চারজন পণ্ডিত এবং সে-যুগের সাধারণ লেখক অবশ্য এখনও দ্বিত্ব মেনে চলেন তবে কালক্রমে এই বিরোধিতা আর থাকবে না। এই বানানটির বিপক্ষে কিছু কিছু বলবার কথা নিশ্চয়ই আছে, তবে এই পদ্ধতি মুদ্রণ-কার্যে খুবই সহায়তা করেছে, ফলে প্রবল প্রতিকূলতা-সত্ত্বেও রেফের পরে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব প্রায় নির্মূল। 'র্য'র স্থলে 'র্য্য' যদি 'অপরিহার্য' হয়, যা নাকি সুনীতিকুমার এখন মনে করেন, তা হলে এই সংস্কার আনতে হবে আর-একটা শক্তিশালী বানান-সংস্কার-সমিতির নির্দেশে। একক সুনীতিকুমার আজ আর এই ভুল বানানের গতিরোধ করতে পারবেন না।

আমাদের মনে হয় রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জনের মূলে যা ছিল তা বানান-সংস্কার নয়, আসল উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রণ-সৌকর্য। বানান-সংস্কার-সমিতির অন্যতম সদস্য ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৩৭৭ সালের শারদীয় সংখ্যা 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় 'বানানবিধির গোড়ার কথা' নামক এক প্রবন্ধে বলেছেন, "দ্বিত্ব-বর্জন সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধানমতে শুদ্ধ। বস্তুত হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় দ্বিত্ববর্জিত বানানই সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত। বাংলায় এই রীতি প্রবর্তন করিলে লেখা ও ছাপা সহজ হইবে অথচ ব্যাকরণের দিক্ দিয়াও বানান অশুদ্ধ হইবে না।"

এই প্রসঙ্গে সংস্কার-সমিতির সদস্যদের নামগুলি দেখলে তাঁদের

চিন্তাধারার কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। বিজনবাবুর উক্ত প্রবন্ধ থেকেই নামগুলি তুলে দিচ্ছি—

"রাজশেখর বসু এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য যথাক্রমে এই সমিতিরও সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। সদস্যরূপে আসেন—প্রমথনাথ চৌধুরী (প্রমথ চৌধুরী), বিধুশেখর ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত চারিজন ব্যতীত আর সকলেই কেন্দ্রীয় পরিভাষা-সমিতির সহিত পূর্ব হইতেই যুক্ত ছিলেন।"

বিজনবাবু এই সমিতিতে প্রমথনাথ বিশির নাম দেন নি, যদিও বিশি মহাশয় পরিভাষা কেন্দ্রীয় সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

তবে এঁরা ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপকও মাঝে মাঝে সমিতিতে আহূত হতেন। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের 'বানান-কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক' নামক এক প্রবন্ধে পাই তিনি একদিন আলোচনা-সভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং সেদিন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-ও সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন। আহূত হয়েছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু-ও, তবে তিনি সভায় গেছেন কিনা জানি না।

তৎকালে আমরা শুনেছিলাম সংস্কার-সমিতি কয়েকজন মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞের পরামর্শও গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসেরই অন্যতম কর্মী অজরকুমার সরকার। রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জন প্রস্তাবে এই অজরকুমারই নাকি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। একথার কোন ভিত্তি আছে কিনা ঠিক বলতে পারব না, তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, অজরকুমারের শ্রদ্ধেয় পিতা বিখ্যাত সাহিত্যিক, 'সাধারণী' 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার রচনা করেছিলেন যুক্তাক্ষরহীন শিশুপাঠ্য কাব্য 'গোচারণের মাঠ'।

রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জন প্রসঙ্গে বিজনবাবুর প্রবন্ধ থেকেই আর খানিকটা উদ্ধৃত করি :

"'কার্ত্তিক বার্ত্তা বার্ত্তিক' এই তিনটি শব্দের জন্যই দ্বিত্ব-বর্জনের সূত্রটা নির্বিকল্প হইতে পারিল না বলিয়া রাজশেখরবাবুর মনে একটা অস্বস্তি রহিয়া গেল। এমন সময় বৈয়াকরণ গোবর্ধন শাস্ত্রী মুশকিল আসান করিয়া দিলেন। তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন—'অর্চনা মূর্ছা অর্জুন কর্তা' আদি শব্দে রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব যেমন বিকল্পে সিদ্ধ তেমনই 'কার্তিক বার্তা বার্তিক' আদি শব্দেও তা বৈকল্পিক বা ইচ্ছাধীন।...পাণিনির ব্যাকরণ এই কথাই বলে।"

আমরা বলছিলাম, রবীন্দ্রনাথ সম্যক্ বিচার-বিবেচনা না করেই সংস্কার-সমিতির বানান-পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বেশ গুরুত্ব দিয়েই এই মন্তব্য করছি। দেবপ্রসাদবাবুর নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে আর কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি :

"তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব। কিন্তু তদ্ভব শব্দে অপণ্ডিতদের অধিকারই প্রবল, অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও কথা চলবে—কিছু কিছু চালাচ্চিও। যেখানে মতে মিলচি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানচি। কেননা অক্ষরকৃত অসত্য ভাষণের দ্বারা তাদের মন মোহগ্রস্ত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও তাদের কথার প্রামাণিকতা যে কম তা আমি বলব না।"

এই মন্তব্যের সঙ্গে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত নিয়ম পালন করার প্রতিশ্রুতির কোন সামঞ্জস্য নেই। এখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন তৎসম শব্দের বানানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মানবেন কিন্তু তদ্ভব শব্দে তিনি স্বমতে চলবেন। তাই যদি হয় তবে আর সংস্কার-সমিতির সার্থকতা কী ছিল? বস্তুতঃ তৎসম শব্দের বানানে ব্যভিচার তেমন

কিছু অন্ততঃ সেকালে ছিল না। ভালই হোক, মন্দই হোক, রবীন্দ্র-নাথের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বানানের একটা রীতি গড়ে উঠেছিল, বিশৃঙ্খলা খুব একটা ছিল না। উৎকট সংস্কৃত-প্রীতিতে তাঁরা বৈদেশিক শব্দেও কঠোর ভাবে ষত্ব-ণত্ব মেনে চলতেন। কেবল 'জিনিষ, পোষাক, তোষক, পাপোষ, পোষ্ট, ব্যারিষ্টার, ষ্ট্যাম্প, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিষ, বায়রণ, গবর্ণমেণ্ট, গুডমর্ণিং' প্রভৃতি শব্দে মূর্ধন্য-ষ এবং মূর্ধন্য-ণ লিখতেন তা নয়, 'শেক্‌স্‌পিয়ার, ম্যাক্সমুলার' পর্যন্ত তাঁদের হাতে হয়ে পড়েছিলেন 'সেক্ষপীয়র, মোক্ষমুলর' (ক্‌+স=ক্‌+ষ=ক্ষ)। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও এইসব বানান ভূরি ভূরি দেখা গেছে। সংস্কার-প্রচেষ্টায় অগ্রণী হলেন রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং। তিনি যখন 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' প্রকাশ করলেন, তখন অবশ্য বানান-সংস্কারে মন দেন নি, লেখার প্রয়োজনেই স্বকীয় বানান উদ্ভাবন করেছিলেন। সংস্কার-প্রয়াস তাঁর দেখা দিল ১২৯২ সালে যখন তিনি 'শব্দতত্ত্ব'র দিকে মন দিলেন। প্রণালীবদ্ধভাবে তিনি একাজে হাত দেন নি। যখন যে-দিকে দৃষ্টি পড়েছে অসঙ্কোচে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। মোটের উপর তাঁর ঝোঁক ছিল সংস্কৃতেতর শব্দে উচ্চারণানুগ বানান—হ্রস্ব-ইকারের প্রতিষ্ঠা, ঙ-কে একক মর্যাদাদান, মূর্ধন্য ণ-এর নির্বাসন, বর্গ্য জ-এর প্রাধান্য স্থাপন, বিসর্গ বিসর্জন, ও-কারের আবাহন, ই-কার ও-কারের দু-একটি বাংলা সন্ধি প্রভৃতি।* এইসব নূতন রীতি কেউ সাদরে বরণ করে নিলেন, কেউ সুতীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে

---

* কবির ধারণা ছিল তিনিই সর্বপ্রথম ঙ'কে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলছেন "বানান-জগতে আমিই বোধ হয় সর্বপ্রথম ঙ'র প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেম"।—(পরিচ্ছেদ ১২)। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রাচীন সাহিত্যে ঙ'র অজস্র একক প্রয়োগ আছে—জানিতাঙ, হইতাঙ, আইলাঙ, কোঙর, সোঙরণ, হঙো (হও)। সমসাময়িক সাহিত্যেও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'শ্রীমতা গ্রন্থকর্ত্রী এঙ কোঙা

এদের উচ্ছেদ-সাধনে অগ্রসর হলেন। স্বৈরাচার আরম্ভ হল। এই স্বৈরাচার অরাজকতায় পরিণত হল সবুজপত্রের যুগে যখন মৌখিক ভাষা লৈখিক ভাষায় সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করল। ভাষায় নূতন নূতন শব্দের আমদানি হতে লাগল এবং উচ্চারণানুযায়ী বানানের ঝোঁক প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল। অরাজকতার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'করিতেছি' এই ক্রিয়াপদটি কথ্য ভাষায় 'করছি'। বানান-সংস্কারের ফলে আজ অবশ্য এই বানানই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংস্কারের পূর্বে এই শব্দটির বানান ছিল ডজন-তিনেক। ক, ক', কো; র, র্, রেফ, সম্পূর্ণ র বা রেফবিহীন; চি, চ্চি, ছি, চ্ছি—এই বর্ণগুলির প্রায় সবরকম সম্ভাব্য বিন্যাস দেখা যেত। একটা সমস্যা বেশ প্রকট হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন 'প্রাকৃত বাংলা' তার বানান হবে মূলানুগ কি উচ্চারণানুগ? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উচ্চারণানুযায়ী বানানের পক্ষপাতী। যাঁরা বানান-সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন তাঁরা অনেকেই এই মত সমর্থন করেন। ফলে কেবল তদ্ভব বা বৈদেশিক শব্দ নয়, তৎসম শব্দও আক্রান্ত হল। 'অভ্যাস, সুবিধা, সন্ধ্যা, বিদ্যা' শব্দগুলির প্রাকৃত রূপ দেখছি 'অভ্যেস, সুবিধে, সন্ধে, বিদ্যে'। সংস্কারকদের মতে এগুলি হচ্ছে উচ্চারণানুগ বানান। আমাদের কিন্তু খট্‌কা লাগছে। আমরা দেখছি সংস্কৃত শব্দগুলির রূপই বিকৃত হয়েছে, কিন্তু উচ্চারণানুগ বানান হয় নি। উচ্চারণানুযায়ী বানান দিতে হলে বানান হওয়া উচিত ছিল 'ওব্‌ভেশ, শুবিধে, শোন্ধে, বিদ্দে'। আমরা জিজ্ঞাসা (জিজ্ঞেস, জিগ্যেস, জিগেস, জিগগেস,

---

বিরচিতং' (১২৭৭), 'ক্যানিঙ্‌ লাইব্রেরী' (১২৮৪)। তবে এসব বিরল প্রয়োগ, স্বতন্ত্র বর্ণরূপে ঙ'র ব্যাপক ব্যবহার এযুগে রবীন্দ্রনাথই প্রচলন করেছেন।

ই-কার ও-কারের সন্ধিও রবীন্দ্রপূর্ব সাহিত্যে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যে 'আমারি, তোমারি, তারি, তাহারো, আরো, আজো' প্রভৃতি বানান প্রচুর পাওয়া যায়।

জিগগেসা, জিগগ্যেস—সবই উদ্ধৃত বানান কিন্তু জিগ্‌গেঁশ দেখি নি) করি এই বানানে শব্দগুলিকে চেনা যাবে ? আরও প্রশ্ন থাকে—তৎসম 'অভ্যাস' শব্দের বানান যদি উচ্চারণের খাতিরে পরিবর্তন করতে হয়, তবে তো 'বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র'র বানানও পরিবর্তন করে লিখতে হয় 'বোংকিমচন্দ্রো, রোবিন্দ্রোনাথ, শুভাশচন্দ্রো'। উচ্চারণপন্থীরা সর্বত্র দৃষ্টি দিচ্ছেন না কেন ?

সুনীতিকুমার বলেন—

"আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষায় বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শত-করা ৪৪টা।"

—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৪

আমাদের মনে হয় উচ্চারণানুযায়ী বানান-পরিবর্তন হলে 'প্রাকৃত বাংলায়' তৎসম শব্দ হাজার-করাও একটা থাকবে না। নূতন বাংলা ভাষার সৃষ্টি হবে।

একথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন—

"বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমনকি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।"

—বাংলাভাষা-পরিচয়, ১২

আমাদের গৃহীত পরিভাষার মূলেও কিছু গোলমাল রয়েছে। 'প্রাকৃত বাংলা' কাকে বলে ? রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই", তখন আমরা মনে করি 'লৌকিক বাংলা'-কেই তিনি 'প্রাকৃত বাংলা' বলছেন। এই অর্থে 'অভ্যাস, জিজ্ঞাসা, সুবিধা, সন্ধ্যা, বিদ্যা' প্রভৃতি শব্দের বানান অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যখন তিনি নিজেই কখন কখন (সব সময়ে নয়) লেখেন 'অভ্যেস, জিগগেসা, সন্ধে, সুবিধে, বিদ্যে'

তখন দেখি 'প্রাকৃত বাংলা' কথাটা তিনি অন্য অর্থে ব্যবহার করছেন। তখন মনে করি 'প্রাকৃত' জনের 'কথ্য' ভাষাকেই তিনি 'প্রাকৃত বাংলা' বলতে চান অর্থাৎ লৌকিক সাধুভাষা নয়, লৌকিক কথ্য ভাষাই 'প্রাকৃত বাংলা'। 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "এই বইয়ে যে-ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিতভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে।" "প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে'—একথার অর্থ 'বাংলা কথ্যভাষার নানা রূপ রয়েছে বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে'। অথচ এর আগেই তিনি বলে নিয়েছেন যে বাংলার 'চলিত-ভাষা'-কেই তিনি 'প্রাকৃত বাংলা' বলেন। তা হলে দাঁড়ায় 'কথ্যভাষা' ও 'চলিতভাষা' একই। কিন্তু তাই কি? যাকে বলি 'চলিতভাষা' তাই কি 'কথ্যভাষা'?

বিদ্যালয়ের প্রশ্নে যখন দেখি "সাধুভাষা থেকে চলিতভাষায় রূপান্তর করো", তখন আমরা জানি শুধু ক্রিয়াপদেরই রূপ পরিবর্তন করতে হয়। সর্বনাম 'তাহার' চলিতভাষায় চলে না বটে, কিন্তু চলিতভাষার 'তার' অবাধে সাধুভাষায় প্রবেশ করেছে। সাধুভাষার 'অভ্যাস, সন্ধ্যা, বিদ্যা' চলিতভাষায়ও 'অভ্যাস, সন্ধ্যা, বিদ্যা'-ই থাকে, 'অভ্যেস, সন্ধে, বিদ্যে' লেখার প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেন—

"সাধুভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান তফাৎটা ক্রিয়াপদের তফাৎ নিয়ে।"

—বাংলাভাষা-পরিচয়, ৯

প্রবন্ধ-লেখকের নিকট লিখিত একখানি চিঠিতে (৫ই জুলাই ১৯৩৩) রাজশেখরবাবুও বলেছেন, "কিন্তু চলিত ভাষা কথ্য ভাষা নয়।"

'চলিতভাষা' ও 'কথ্যভাষা' যে এক নয় তার দৃষ্টান্ত রাজশেখর বসুর মহাভারতের যে-কোন অংশ পড়লেই বোঝা যাবে ঃ

"অভিষেকের দিনে অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও রাজাদের সঙ্গে নারদাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞশালার অন্তর্গৃহে প্রবেশ করলেন। ঋষিগণ কার্যের অবকাশে গল্প করতে লাগলেন।"

—দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ১১৬

একমাত্র ক্রিয়াপদের জন্যই তৎসম শব্দবহুল এই ভাষা 'চলিত-ভাষা', অর্থাৎ এটা সাহিত্যিক ভাষা কিন্তু 'চলিত',—'কথ্যভাষা'-ও নয়, 'সাধুভাষা'-ও নয়, 'লৌকিক ভাষা' তো নয়ই। এর সঙ্গে তুলনা করা যাক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণ' থেকে একটি অংশ ঃ

"সূর্পণখাকে আবার ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া খর বলিল, আবার কী হইয়াছে ? তোমার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা কি সেই মানুষ তিনটাকে মারিতে পারে নাই ?"

তৎসম শব্দের অংশ একেবারেই নগণ্য হলেও একমাত্র ক্রিয়াপদের জন্যই এই ভাষাকে বলা হয় 'সাধুভাষা'—এ ভাষা 'চলিত'-ও নয়, 'কথ্য'-ও নয়। কিন্তু এই দুই উদ্ধৃতির মধ্যে কোন্ ভাষা 'প্রাকৃত বাংলা' ? কোন্ ভাষা 'প্রাকৃত' জনের নিকটতর ?

আমাদের ধারণা কেবল 'কথ্যভাষায়' উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য রচিত হতে পারে না ; কিন্তু 'চলিতভাষায়' বহু দর্শন-বিজ্ঞানের সাহিত্য আমরা পেয়ে গেছি। বেশী দূরে যেতে হবে না। 'চলিতভাষায়' লেখা রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল সাহিত্যসম্ভার আমাদের চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত রয়েছে—পূরাপূরি 'কথ্যভাষায়' রচিত গাম্ভীর্যপূর্ণ একখানি গ্রন্থও এর মধ্য থেকে আবিষ্কার করা যাবে না। চলিতভাষায় রচিত রবীন্দ্র-নাথের চিন্তামূলক প্রবন্ধসমূহে 'অভ্যেস, সুবিধে' প্রভৃতি বিকৃত তৎসম শব্দ কিছু কিছু আছে ঠিকই, তবে সংখ্যায় খুবই কম, 'অভ্যাস, সুবিধা' বানানই বেশী। আগাগোড়া কথ্যভাষায় রচিত হতে পারে

কেবল ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, নাট্যসাহিত্য, শিশুসাহিত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা এই শ্রেণীর সাহিত্যও 'প্রাকৃত জনের' ভাষা নয়। যিনি যা-ই বলুন,

> "একথা স্বীকার করতেই হবে সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ-বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে।···খাঁটি বাংলা ছিল আদিম কালের, সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ ষোলো-আনা চলা অসম্ভব।"
>
> (রবীন্দ্রনাথ—বাংলাভাষা-পরিচয়, ১০)

বাংলা ভাষা মূলতঃ "সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষা—উচ্চভাবের শব্দ এগুলিতে (সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষাগুলিতে) সংস্কৃত হইতেই লওয়া হয় এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ গঠিত করিয়া এগুলিতে ব্যবহার করা হয়।"

(সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা' ১৩৫৬, পৃ. ৯২)

চলিত রূপই হোক, আর সাধু রূপই হোক, সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে কিংবা সংস্কৃতকে বিকৃত করে কেবল তদ্ভব, অর্ধতৎসম আর বৈদেশিক শব্দে রচিত হলে বাংলা ভাষার বর্তমান পরিচয় থাকবে না। এত কথা বলছি এই জন্য যে বাংলা ভাষার আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্তন না করলে সম্পূর্ণ উচ্চারণানুগ বর্ণবিন্যাস আমরা সম্ভব বলে মনে করি না। ধ্বন্যাত্মক বানানের খাতিরে তৎসম শব্দের বানান-বিকৃতি যে সংস্কার-সমিতিও সমর্থন করেন নি তা জানা যাবে বিজনবাবুর লেখা 'বানানবিধির গোড়ার কথা' প্রবন্ধেও।

> "বানান-সংস্কার-সমিতি সকল মতই শ্রদ্ধাসহকারে বিচার করেন। ধ্বন্যাত্মক বানানের প্রবর্তনের প্রস্তাবগুলিও আলোচিত হয়। স্থির হয় ধ্বন্যাত্মক বানানের সার্বত্রিক প্রয়োগ

সম্ভব নয়, সংগতও নয়। অতৎসম, অর্ধতৎসম, দেশী, বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে বানান-সংস্কার বিষয়ে কিছু দূর পর্যন্ত উচ্চারণের আনুগত্য স্বীকার করিলেও তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে তাহা করা কখনো উচিত হইবে না।"

সবশেষে 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার ভূমিকায় দেওয়া সংস্কার-সমিতির নিজস্ব বক্তব্য উদ্ধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করি।—

"অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে এবং প্রয়োজনমত এইরূপ আরও শব্দ গৃহীত হইতে পারে। এইসকল শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানাদির শাসনে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।"

* * *

আলোচনা আরম্ভের পূর্বে দেখা যাক বাংলা বানানে সমস্যা উপস্থিত হয় কোথায় কোথায়।

উচ্চারণে অ—ও—হসন্ত, ই—ঈ, উ—ঊ, ঋ—রফলা হ্রস্ব-ই বা দীর্ঘ-ঈ, এ—অ্যা, ঐ—অই—ওই, ঔ—অউ—ওউ, ং—ঙ—বর্গের পঞ্চমবর্ণ, বিসর্গ, ক্ষ—খ, চ—ছ, জ—য—Z, ঞ, ণ—ন, ফ—F, বর্গ্য-ব—অন্তঃস্থ-ব, ভ—V, শ—ষ—স, ইয়া—ইআ, উয়া—উআ, এয়া—এআ, ওয়া—ওআ।

সংস্কার-সমিতির সূত্র ধরে ধরেই আলোচনা শুরু করি।

সংস্কার-সমিতির প্রথম সূত্রই হচ্ছে সংস্কৃত শব্দে রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জন। তথাস্তু। কিন্তু একটা নূতন উপদ্রব দেখে আতঙ্কিত হচ্ছি। 'কার্ত্তিক'কে না হয় 'কার্তিক' করলাম, 'আচার্য্য'কেও 'আচার্য' করলাম, কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ আবার একটা 'নয়া' বানান সৃষ্টি করেছেন রেফের স্থানে র্‌। ১৩১৯ সালে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির পুনর্মুদ্রণ হয় নি, হয়েছে 'পুনর্‌মুদ্রণ'। অতএব আমরা 'নির্‌দ্বিধায়' লিখতে পারি 'প্রাতর্‌ভ্রমণ, অন্তর্‌ধান, বহির্‌ভূত, প্রাদুর্‌ভাব,

চতুর্‌বেদ'! আর একটু অগ্রসর হলেই বা ক্ষতি কী? 'সূর্‌য, সর্‌ব, কর্‌ম, অর্‌ধ, কর্‌তা, অর্‌চনা'। রেফের খোঁচা আর থাকল না।

'নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো'র কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটা নূতন বানান উদ্ভাবন করেছিলেন। সেটা আবার ঠিক বিপরীত—'কর্ব্ব, ধর্ব্ব, পার্ব্ব, মার্ব্ব, কর্ত্তে, ধর্ত্তে, পার্ত্তে, মার্ত্তে'। কিন্তু 'নতুন' (সুনীতিকুমার বলেন, শুদ্ধ বানান 'নোতুন') হলেই বাজারে তা সব সময়ে চলে না। সে-যুগে 'পার্ত্তে মার্ত্তে'র দু-একজন অনুকারী জুটেছিল ঠিকই, কিন্তু বানানটা বেশী দিন টিকল না।

রেফের পর দ্বিত্ববর্জন-প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণও তৎকালে ছিল বিস্ময়াবহ। ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্রে দেখা যেত—প্রথম পত্রে দ্বিত্ব সগৌরবে বিরাজিত, দ্বিতীয় পত্রে দ্বিত্ব নিঃশেষে বিতাড়িত। পাঠ্যপুস্তকের অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বিত্ব বর্জিত, কিন্তু খাস বাংলা সাহিত্যগ্রন্থে দ্বিত্ব সুরক্ষিত। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

রেফের পর দ্বিত্ব নিয়ে আর বেশী নাড়াচাড়া করতে চাই না, কারণ দ্বিত্ববর্জন একরকম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

সংস্কার-সমিতির দ্বিতীয় সূত্র—"সন্ধিতে ঙ্‌ স্থানে ং। যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে ং অথবা বিকল্পে ঙ্‌ বিধেয়; যথা—অহংকার, ভয়ংকর, সংগম, সংঘাত অথবা অহঙ্কার ভয়ঙ্কর, সঙ্গম, সঙ্ঘাত। 'গংগা* সংগে' ইত্যাদি হইবে না, কারণ শব্দের পূর্বে ম্‌-কারান্ত পদ নাই।"

উদাহৃত শব্দগুলি দেখলেই বোঝা যাবে এই নিয়মটিও সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত। সংস্কৃতে বিকল্প-ব্যবস্থাই আছে। কিন্তু বিকল্পই যদি রক্ষিত হবে তবে নিয়ম-রচনার প্রয়োজন কী ছিল বুঝি না। নিয়ম-রচনার ফলে যেখানে সচরাচর একটি বানানই মাত্র

---

* নিপাতনে সিদ্ধ হলেও 'গঙ্গা'-র 'ঙ্‌' কিন্তু 'ম্‌'-স্থানেই জাত।
—প্রবন্ধলেখক

প্রচলিত ছিল, সেখানে দুটি বানানের আবির্ভাব হল। পূর্বে 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর, সঙ্গম, সঙ্ঘাত' বানানই ছিল জনপ্রিয়। কদাচিৎ দু-একজনে লিখতেন 'অহংকার, ভয়ংকর'। 'সংগম' তৎকালে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পূর্ববর্তী যুগে অবশ্য লেখা হত 'সঙ্ক্রান্তি, সঙ্খ্যা, সঙ্গ্রহ'। তবে এ বানান আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তার জন্য নিয়ম-রচনার প্রয়োজন হয় নি। সংস্কার-সমিতি 'গংগা, সংগে' বানান স্বীকার করেন নি, কিন্তু সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন কে আর মনে রাখে 'গংগা' সিদ্ধ কি নিষিদ্ধ, কিংবা 'সঙ্গে' শব্দের ব্যুৎপত্তি কী। অতএব 'অংগ, ভংগ, তুংগ, পংক' সবাই এক 'সংগে' পরম 'রংগে' 'বংগ' ভাষার 'অংক' জুড়ে বসল। যেসমস্ত বানানে স্বেচ্ছাচার তৎকালে বড় একটা দেখা যেত না সেসমস্ত ক্ষেত্রেও নূতন করে বৈকল্পিক নব্য ঢং শুরু হল।

উচ্চারণের খাতিরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটিমাত্র শব্দে 'ঙ্গ' থেকে 'গ' বিচ্ছিন্ন করে 'ঙ'কে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন বটে কিন্তু সেসব শব্দ ছিল তদ্ভব—তৎসম শব্দে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নি। 'বঙ্গ' শব্দ থেকে 'বাঙ্গালা' 'বাঙ্গলা'—আমরা দুই বানানেরই সাক্ষাৎ পাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। রবীন্দ্রনাথ 'বাঙ্গলা' না লিখে প্রথমে লিখলেন 'বাঙ্‌লা', পরে 'বাংলা'। 'বাঙ্গালী, কাঙ্গালী, ভাঙ্গা, রাঙ্গা' রবীন্দ্রনাথের হাতে হল 'বাঙালি, কাঙালি, ভাঙা, রাঙা'। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে 'গ' লোপ পেয়েছে ঠিকই, তবে পূর্ববঙ্গের কণ্ঠ থেকে কিন্তু অদ্যাপি 'ঙ্‌গ' ধ্বনির কোন বর্ণ স্খলিত হয় নি।

দ্বিতীয় সূত্রে সংস্কার-সমিতি 'ঙ্‌ স্থানে অনুস্বার' বলেই ক্ষান্ত হন নি। "সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়" তা-ও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; তবে "সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে" তাই অনুস্বারের ঝড় ক খ গ ঘ পর্যন্ত এনেই নিরস্ত হয়েছেন, চ-ট-ত-প বর্গগুলিকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ এক নিষ্ঠাবান্ প্রবীণ পণ্ডিত কবি-সাহিত্যিকের চিঠিতে পেয়ে বসলাম 'সংপূর্ণ'—ইনি অবশ্য 'গংগা, বংগ, সংগ' বানান সহ্য করতে পারতেন না। এঁর লেখায়ও 'সংপূর্ণ' পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম —ভাবলাম এর পরই এসে যাবে 'সংপর্ক, সংপাদক, সংপ্রদান'। ক্রমে 'সংমুখে, সংমান, সংচয়, সংজয়'; এবং তারপর 'অংড, অংত, কাংত, ক্ষাংত'। এতে মুদ্রণ-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হবে নিঃসন্দেহ, তবে এই বানান গৃহীত হলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য একমাত্র প্রাচীনপুঁথি-পাঠকেরই গবেষণার বিষয় হয়ে থাকবে।

তৃতীয় নিয়মে অসংস্কৃত শব্দে রেফের পর বর্ণদ্বিত্ব বারণ করা হয়েছে। এর আলোচনা আগেই হয়ে গেছে।

চতুর্থ নিয়ম হস্-চিহ্ন সম্পর্কে। বলা হয়েছে "শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে না।" উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কয়েকটি বিদেশী শব্দের—'ওস্তাদ, চেক, ডিশ, পকেট, টি-পট, মক্তব'। সাধারণতঃ এসব শব্দে হস্-চিহ্ন দেওয়াও হয় না। কিন্তু যদি দৈবাৎ কেউ দু-একটি শব্দে হস্ দিয়েই বসেন, তেমন কিছু অপরাধ হয় বলে মনে করি না। উদাহরণগুলির মধ্যে দুটি আছে বাংলা ক্রিয়াপদ "করিলেন, করিস'। 'করিলেন' শব্দে অদ্যাবধি কেউ হস্-চিহ্ন দেখেছেন কি? এ উদাহরণ কেন? 'করিস' শব্দে অবশ্য অনেকে হস্-প্রয়োগের পক্ষপাতী। কিন্তু সংস্কার-সমিতি চান না। বেশ। মেনে নিতে হবে।

পরে সাবধান করা হয়েছে "কিন্তু ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্-চিহ্ন বিধেয়; যথা—শাহ্, তখ্ত্, বণ্ড্। সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—আর্ট, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ।" কোন্ শব্দ 'সুপ্রচলিত' বা কার কাছে কোন্ শব্দের 'ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা' তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবুদ্ধির উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ যে-শব্দগুলি এখানে দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত শব্দই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে 'সুপ্রচলিত' মনে হবে—হস্-চিহ্ন থাকুক, না থাকুক, কোন

ক্ষেত্রেই এদের ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা যদি 'খঞ্জ' শিখে 'স্পঞ্জ' শব্দ অ-কারান্ত উচ্চারণে পড়ে তবে শব্দটি যতই 'সুপ্রচলিত' হোক, শিশুদের দোষ দেওয়া চলবে না। পাঠশালার যে-ছেলেটিকে সবে আর্ক-ফলার 'অর্ক, বর্গ, আর্ত, আর্থ' শেখানো হয়েছে, সে যদি 'সুপ্রচলিত' 'আর্ট' শব্দের উচ্চারণে ভুল করে তাকে ক্ষমা করতে হবে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে কাঙ্গালীচরণ যখন 'ক্লায়েন্ট'কে 'ক্লায়েণ্টো' বলে তখন সে যে 'গভর্নমেণ্ট'কে 'গভর্নোমেণ্টো' বলবে না এ গ্যারান্টি কে দেবে? এই শব্দটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা প্রচুর হাস্য করেছিলেন। অবশ্য হস্-চিহ্ন নিয়ে নয়, উচ্চারণ নিয়ে, শব্দমধ্যে বর্ণবিশেষের বেকারদশা দেখে। উদাহরণ রচনাকালে সংস্কার-সমিতি 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ লাইন কয়টি স্মরণ করতে পারতেন—"বাংলায় এ উপদ্রব নাই। কেবল একটিমাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ সঙ্গীন্ ঘাড়ে করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইতেছে, সেটা আর কেহ নয়—'গবর্ণমেণ্ট' শব্দের মূর্ধন্য-ণ! ওটা বিদেশের আমদানি নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটাকে বিদায় করা ভালো।" রবীন্দ্রনাথের বানান 'গবর্মেণ্ট'।

হস্-চিহ্ন সংক্রান্ত আরও দু-একটি নিয়ম দেওয়া হয়েছে বৈদেশিক শব্দের বানান-প্রসঙ্গে। এসব বিধান আমাদের বিবেচনায় অনাবশ্যক। বৈদেশিক শব্দে হস্-চিহ্ন দেওয়া না দেওয়া লেখকের রুচির উপর ছেড়ে দিলেই চলে, এতে তেমন কিছু অনর্থ হয় না। অথচ যেখানে হস্-চিহ্নের ব্যবহারে সুস্পষ্ট বিধানের প্রয়োজন, সেখানে সংস্কার-সমিতি নীরব। আধুনিক লেখকেরা অনেকেই হস্-বিরোধী। কিন্তু আমরা মনে করি তৎসম শব্দে হস্-বর্জন গুরুতর অপরাধ। 'বাক্, ত্বক্, দিক্, ধিক্, ণিচ্, ষট্, পৃথক্, বণিক্, সম্যক্, বিরাট্ (বিরাজ্), আপদ্, বিপদ্, মহান্, ভগবান্, গুণবান্, বুদ্ধিমান্, শক্তিমান্, শ্রীমান্, হনূমান্' প্রভৃতি শব্দের, 'নির্, দুর্, সম্' উপসর্গের এবং ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর শেষ বর্ণে

হস্-চিহ্ন না দিলে শব্দগুলির সন্ধি-সমাসে ভুল-ভ্রান্তি অনিবার্য। হস্-চিহ্ন না থাকলে 'মতুপ্'-এর 'মান্' ও 'শানচ্'-এর 'মান' নিয়ে সাহিত্যিকেরাও অনেকে বিপন্ন হবেন। 'তুরাবস্থা, তুরাদৃষ্ট, বাগেশ্বরী' প্রভৃতি অপশব্দ হস্-চিহ্নে শিথিলতার ফল কিনা জানি না, তবে 'পৃথকান্ন, বিপদোদ্ধার, অন্তরেন্দ্রিয়' জাতীয় তুষ্ট সন্ধির অন্য কোন কারণ নেই। 'পৃথক্কৃত' বা 'পৃথক্কৃত' শব্দ যে অভিধানেও 'পৃথকীকৃত' রূপে স্থান পেয়েছে, তারও কারণ হস্-চিহ্নে অনবধানতা। 'পৃথক্' শব্দ ঈ-যোগে 'পৃথকী' হয় না, হয় 'পৃথগী', তা ছাড়া, 'চ্বি' প্রত্যয় বিহিত স্বরান্ত শব্দে, ব্যঞ্জনান্ত শব্দে নয়; যে-কয়টি ব্যতিক্রম আছে তাদের মধ্যে 'পৃথক্' শব্দ নেই। হস্-চিহ্নের অমনোযোগিতায় 'ষড়্‌যন্ত্র, ষড়্‌দর্শন, ষড়্‌বিধ, ষড়্‌রিপু' প্রভৃতি শব্দ পণ্ডিতেরাও ভুল উচ্চারণে পড়েন। হস্-চিহ্ন না থাকলে 'অষ্টক'-ধ্বনি অনুযায়ী 'ষট্‌ক' 'ষটক্' হয়ে যাবে (sestet ষষ্ঠক বা ষড়ক নয়, ষট্‌ক)। খড়্‌গপুর আমাদের মুখে খড়গ্‌পুর হয়ে গেছে কেন?

ভাগ্যে বর্ণমধ্যে একটি খণ্ড-ত (ৎ = হসন্ত ত) আছে, তাই এই বর্ণ-যুক্ত শব্দের উচ্চারণে বড় একটা ভুল হয় না। তবে উল্টা বিপত্তি মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। বাংলায় অন্ত্য অ-কারের উচ্চারণ না থাকাতে ছাপার অক্ষরে তো বটেই অনেক প্রবীণ অধ্যাপকের হাতের লেখায়ও 'উচিৎ, কুৎসিৎ'-এর ছড়াছড়ি দেখে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। এই সূত্রে আরও এক দিকে সুধীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সমাসাশ্রিত না করলে 'দ্'-কারান্ত শব্দ আমরা তুই ভাবেই বানান করে থাকি—বিপদ্, আপদ্, সম্পদ্; সুহৃদ্, সুহৃৎ; সংসদ্, সংসৎ; পর্ষদ্, পর্ষৎ; পরিষদ্, পরিষৎ; উপনিষদ্, উপনিষৎ। এই শব্দগুলিতে যখন বিভক্তি লাগাই, তখন সচরাচর একটামাত্র বানানই অর্থাৎ শুধু 'দ্'-ই চলে—বিপদে, বিপদের, আপদে, আপদের, সম্পদের, সুহৃদের, সংসদের, পরিষদের, উপনিষদের। কিন্তু 'মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ্' বা '-পর্ষৎ' বলে যে প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বিভক্ত্যন্ত করে কেউ কেউ

লিখতে শুরু করেছেন 'মধ্যশিক্ষা-পর্ষতে, পর্ষতের'। ভাগ্যে এখন পর্যন্ত 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষতের' দর্শন পাই নি। 'পর্ষতে, পর্ষতের' দুর্গতি আর বেশী দিন সহ্য না করা ভাল। সুপরিচিত একটিমাত্র বাংলা শব্দ দ হারিয়ে সর্বত্র ত গ্রহণ করেছে। সে-শব্দটি 'শরৎ' (শরতে, শরতের)। তবে মাইকেল পর্যন্ত 'শরদে' বানানই রক্ষা করে গেছেন—'কি বসন্তে কি শরদে'। হসন্ত-প্রসঙ্গে দেশনায়ক গোপালকৃষ্ণ 'গোখলে' নামটির ভ্রমাত্মক উচ্চারণের দিকেও আমরা দৃষ্টি দিতে পারি। 'গোখলে'-র 'খ' অ-কারান্ত। কিন্তু হিন্দী প্রভাবে 'গোখলে' হয়েছেন 'গোখ্‌লে', ইংরেজী বিভ্রান্তিতে গোখলে হয়েছেন 'গোখেল' (Go kha le)।

পঞ্চম নিয়মটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ, হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ। আজ ৮০।৯০ বছর পর্যন্ত বাংলা বানানে হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ নিয়ে যত আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, এত আর কোন বানান নিয়ে হয় নি। অতএব এই প্রসঙ্গটি সবিস্তারেই আলোচনা করতে চাই।

অন্যান্য পণ্ডিতের কথা তুলছি না। এ ব্যাপারে বানানরাজ্যে যিনি বিপ্লব এনেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এবং বানান-সংস্কারে রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'কর্ণধার' মনে করেন সেই সুনীতিকুমারের মধ্যে মতভেদ আকাশ-পাতাল। রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক হ্রস্ব-ইকারের দিকে, সুনীতিকুমারের আসক্তি দীর্ঘ-ঈকারের প্রতি। 'ঘটী' শব্দ সংস্কৃত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'ঘটি'। 'নিম্নস্থানস্থিত' অর্থে 'নীচ' শব্দ সংস্কৃত চৈতন্য-শ্লোকাষ্টক, মেঘদূতম্, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা, মনুসংহিতা, এমন কি ঋগ্‌বেদেও আছে। এইসকল গ্রন্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল এবং 'নীচ' বানান নিশ্চয়ই তিনি বহুবার দেখেছেন। কিন্তু কবির হঠাৎ মনে হল 'নীচ' শব্দ 'below' অর্থে সংস্কৃত ভাষায় নেই, অতএব তিনি বেশী চিন্তাভাবনা না করেই বিধান দিয়ে বসলেন "নিচে শব্দটিকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত বাংলা বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকি" (শব্দতত্ত্ব, অগ্রহায়ণ ১৩৪২ সংস্করণ)। দেবপ্রসাদবাবুর নিকট একখানি

চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'দায়ী' শব্দের বানান লিখেছিলেন 'দায়ি'। দেবপ্রসাদবাবু আক্রমণ করলে কবি উত্তর দিলেন "জরাজনিত মনোযোগের দুর্বলতা"। আমরা কিন্তু তা মনে করি না। আমাদের বিশ্বাস "প্রবণতাজনিত মনোযোগের দুর্বলতা"। আসলে 'দায়ী' যে তৎসম শব্দ রবীন্দ্রনাথ অতটা মনোযোগ করে দেখেন নি, এবং হ্রস্ব-ইকার-প্রবণতার জন্যই লিখেছিলেন 'দায়ি'। তবে দেবপ্রসাদবাবুর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের অতটা বিচলিত হওয়ার তেমন হেতু ছিল না, কারণ 'দায়ক' অর্থে 'দায়ী' শব্দ তৎসম হলেও, 'responsible' অর্থে শব্দটি সংস্কৃত নয়, বাংলা। রবীন্দ্রনাথের বিধানে শেষোক্ত অর্থে 'দায়ি' বানান ভুল নয়।

পক্ষান্তরে, সুনীতিকুমার তৎসম শব্দ তো দূরের কথা, মূলে দীর্ঘ-ঈকার থাকলে তদ্ভব শব্দতেও কদাপি হ্রস্ব-ইকার দেবেন না। 'একটি, কলমটি, গাছটি' সুনীতিকুমারের হাতে 'একটী, কলমটী, গাছটী', কারণ 'টী' সংস্কৃত 'বধূটী' শব্দ থেকে আগত।* 'খুঁটিনাটি' সুনীতিকুমারের লেখনীতে 'খুঁটীনাটী'। ১৯৫০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত সুনীতিকুমারের 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই 'খুঁটীনাটী' মুদ্রিত আছে। ১১২ পৃষ্ঠায় দেওয়া কয়েকটি বৈদেশিক শব্দের বানান দেখলেই সুনীতিকুমারের প্রবণতা কোন্ দিকে বোঝা যাবে—

ফরাসী, আরবী, তুর্কী, আমীর, উজীর, নকীব, মীর্জা, বক্সী, আদমশুমারী, ওয়াশীল, বীমা, উকীল, দলীল, ফরিয়াদী, ঈদ, গাজী, নবী, শহীদ, সুন্নী, হদীস, হুরী, আতশবাজী, কাঁচী, দূরবীন, বরফী, মিছরী, মীনা, মুহুরী, সানকী।

প্রবন্ধ-লেখকের কাছে একখানি চিঠিতে সুনীতিকুমার ইংরেজী report শব্দের বাংলা বানান লিখেছিলেন 'রীপোর্ট'। প্রশ্ন করলে উত্তর দিলেন "খেয়াল ছিল না।" অর্থাৎ খেয়াল না থাকলে

* অবশ্য এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।—প্রবন্ধলেখক

রবীন্দ্রনাথের কলমে আসে হ্রস্ব-ইকার, সুনীতিকুমারের আসে দীর্ঘ-ঈকার। কথাপ্রসঙ্গে সুনীতিকুমার একদিন বলেওছিলেন "দীর্ঘ-ঈকার 'ী' লেখা সোজা"। বাস্তবিকই বাংলা বর্ণবিন্যাসে স্বরচিহ্নের মধ্যে হ্রস্ব-ইকার 'ি' লেখাই সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক। সাধারণ কথাবার্তার যুক্তি হয়তো গাম্ভীর্যপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না, তবে সুনীতিকুমারের দীর্ঘ-ঈকার-প্রবণতার এটাও একটা কারণ যে হতে পারে না তা নয়।

হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ প্রসঙ্গে বানান-সংস্কার-সমিতিও দ্বিধাগ্রস্ত। রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জনের ক্ষেত্রে সমিতি দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, কিন্তু হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ ব্যাপারে সমিতি যেন অসহায়। ফলে কবির ভাষাই মনে আসে :

"দেশ অরাজক ?"

"অরাজক কে বলিবে, সহস্ররাজক।"

সমিতির বিধানগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

"যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে ; যথা—'কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব' অথবা 'কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব'।" অর্থাৎ বাংলা ভাষার সবচেয়ে বিতর্কিত অংশের বানানে কোন বিধিব্যবস্থা নেই—যার যা খুশি লেখো। কিন্তু সমিতি দু-একটা ব্যতিক্রম রেখেছেন : "কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই, অথবা কেবল উ হইবে ; যথা—নীলা (নীলক), হীরা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়), চুল (চূল), তাড়ি (তাড়ী), জুয়া (দ্যূত)।" এই শব্দকয়টির বিশেষ সৌভাগ্যের কারণ কিছু বোঝা গেল না। 'ঊনিশ, পূব' যদি চলে, তবে 'নিলা, হিরা'তে বাধা কোথায় বুঝতে পারি না।

এই নিয়মের পরবর্তী অংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে ; যথা—কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী,

ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে; যথা—'ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি'। 'পিসী, মাসী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি, মাসি' লেখা চলিবে।"

ব্যতিক্রম ও বিকল্প-বিধান সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ থাকলেও আমরা এই মূল নিয়মটিকে পূর্ণ সমর্থন জানাই। এই নিয়ম খুবই যুক্তিপূর্ণ, খুবই সমীচীন। কিন্তু সাহিত্যিকদের সামলাবে কে? সুনীতিবাবু বা বানান-সমিতির কর্ম নয়। সাহিত্যিকেরা, তার চাইতে বলা উচিত 'আধুনিকেরা', এই নিয়ম একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। কেন? কারণ? কারণ এক নম্বর—তাঁদের পিছনে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং দুই নম্বর—বানান-সমিতির হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ সংস্কারে প্রথম অংশের দুর্বলতা। রবীন্দ্রনাথের অভিমত পরে দিচ্ছি। তার পূর্বে ই-ঈ প্রসঙ্গে সমিতির অবশিষ্ট নিয়মটিও উদ্ধার করি: "অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্ম-বাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে; যথা—বেঙাচি, বেঁজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি।" এই নিয়মটিও খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং সুখের বিষয় এই শ্রেণীর শব্দগুলিতে দু-একজন ব্যতীত শিক্ষিত লেখকের বানানে তেমন কিছু ব্যভিচার দেখা যায় না।

এইবার হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবন করি। কবির হ্রস্ব-ই-প্রবণতার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। একমাত্র সর্বনাম 'কী' শব্দ ছাড়া 'প্রাকৃত বাংলায়' দীর্ঘ-ঈকে কবি কখনও ছাড়পত্র দেবেন না। "বিশুদ্ধ বিস্ময়-প্রকাশের কাজে"-ও কবি 'কী' বানান ইচ্ছা করেছেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের মতে 'প্রাকৃত বাংলায়' ঈ-কার নেই। এমন কি সংস্কৃত 'নীচ' শব্দেরও বাংলায় 'নীচে' বানান রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত নয়—একথাও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক লেখকেরা এখানে-সেখানে অন্য দু-চারটি ভুল করলেও করতে পারেন, কিন্তু 'নীচে' শব্দে যে দীর্ঘ-ঈ চলবে না একথা কদাপি বিস্মৃত হন না।

'বাংলাভাষা-পরিচয়' থেকে একটিমাত্র অংশ (১৩-র শেষ অণুচ্ছেদ) তুলে দিলেই রবীন্দ্রনাথের হ্রস্ব-ইকার সম্বন্ধে যুক্তি পরিষ্কার বোঝা যাবে ঃ

> "এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন'এ দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়। খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃতভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এইসকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ইকারকে মানব। 'ইংরেজি' বা 'মুসলমানি' শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে, সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচে হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত।"

স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রয়োগ করতেও রবীন্দ্রনাথ অসম্মত। অতএব অন্যান্য শব্দে যে তিনি "খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব-ইকারকে"ই মানবেন, এ তো স্বতঃসিদ্ধ। 'বাংলাভাষা-পরিচয়' প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, অর্থাৎ 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতি'র সর্বশেষ নিয়মাবলী প্রকাশেরও পরে। গ্রন্থখানির ভূমিকা 'ছাত্রপাঠকদের প্রতি'। গ্রন্থখানির উৎসর্গ 'ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে'। এর দ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হয় যে কবি এ গ্রন্থে নিছক 'কাব্যি' করেন নি, বেশ গুরুত্ব দিয়েই তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া, তাঁর এই মত নূতন নয়। 'শব্দতত্ত্ব'-যুগ থেকে একাধিকপ্রবন্ধে তিনি তাঁর এই প্রবণতা নানা সূত্রে আমাদের জানিয়ে আসছেন। ১৩০৮ সালের ১২ই আশ্বিন,

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করছি ঃ

"সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেই জন্য তাহা পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোনো অবস্থাতেই দাগিন্ হয় না।"

ই প্রত্যয় :—

ধর্ম ও ব্যবসায় অর্থে—গোলাপি, বেগুনি, চালাকি, চাকৃরি, চুরি, ডাক্তারি, মোক্তারি, ব্যারিষ্টারি, মাষ্টারি।

অনুকরণ অর্থে—সাহেবি, নবাবি।

দক্ষ অর্থে—হিসাবি, আলাপি, ধ্রুপদি।

বিশিষ্ট অর্থে—দামি, দাগি, রাগি, ভারি।

ক্ষুদ্র অর্থে—হাঁড়ি, পুঁটুলি, কাঠি।

দেশীয় অর্থে—মারাঠি, গুজরাটি, আসামি।

স্বার্থে—হাসি, ফাঁসি, লাথি, পাড়ি।

স্ত্রীলিঙ্গে ই :—

ছুঁড়ি, ছুকরি, বেটি, খুড়ি, মাসি, পিসি, দিদি, পাঁঠি, ভেড়ি, বুড়ি, বাম্‌নি।

স্ত্রীলিঙ্গে নি :—

কলুনি, তেলিনি, গয়লানি, বাঘিনি, মালিনি, ধোবানি, নাপিতনি, কামার্‌নি, চামার্‌নি, পুরুতনি, মেতরানি, তাঁতিনি, ঠাকুরানি, চাকৃরানি, উড়েনি, কায়েতনি, খোট্টানি, মুসলমান্‌নি, জেলেনি।

তবে রবীন্দ্রনাথ দেবপ্রসাদবাবুর নিকট লিখিত চিঠিতে যে বলেছেন "হাতের লেখায় অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না—কিন্তু ছাপার অক্ষরে পারব"—সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নি।

'বাংলাভাষা-পরিচয়' প্রথম প্রকাশিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে বিশ্বভারতী রচনাবলীতে, পরে সরকারী তত্ত্বাবধানে শতবার্ষিক সংস্করণ রচনাবলীতে। তিনটিই নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান কিন্তু এই তিন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই কবির প্রতি অবিচার করেছেন। কবি স্পষ্ট ভাষায় পুনঃ পুনঃ যেখানে দীর্ঘ-ঈকার বর্জন করে হ্রস্ব-ইকার প্রতিষ্ঠার বিধান দিচ্ছেন, সেখানে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই মুদ্রিত গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে সূত্রের সঙ্গে দৃষ্টান্তের মিল নেই। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে যেখানে কবি বার বার বলছেন, "খাপছাড়াভাবে সংস্কৃতের অনুসরণে নী ও ঈ প্রত্যয়ের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাবার রীতি বাংলায় আছে, কিন্তু তাকে নিয়ম বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণকেও মেনে চলবার অভ্যেস তার নেই। সংস্কৃতে ব্যাঘ্রের স্ত্রী 'ব্যাঘ্রী', বাংলায় সে 'বাঘিনী'। সংস্কৃতে 'সিংহী'ই স্ত্রীজাতীয় সিংহ, বাংলায় সে 'সিংহিনী'।"—এখানে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত বানান সম্ভবতঃ 'বাঘিনি, সিংহিনি'। তবে এই স্থলে 'বাঘিনী, সিংহিনী' বানান স্বীকার করে নিলেও এর পরের দৃষ্টান্তগুলি ভ্রমাত্মক বলেই মনে করি। 'উটী, মোষী, মোষিনী, মাদী মোষ, নাতনী, হাতিনী, কুকুরী, বিড়ালী, কুকুরনী, বিড়ালনী' সবগুলি শব্দই হ্রস্ব-ইকারান্ত হওয়া উচিত ছিল। 'খোট্টানি, উড়েনি' ঠিক আছে, কিন্তু ঠিক পরবর্তী 'পাঞ্জাবিনী, শিখিনী, মগিনী, মাদ্রাজিনী, বাঙালিনী, কাঙালিনী' শব্দগুলিও হ্রস্ব-ইকারান্ত হবে। 'দিদি, মাসি, পিসি, শাশুড়ি, ভাইঝি, বোনঝি'র মাঝখানে একটা 'শ্যালী' থাকে কী করে? পরবর্তী দৃষ্টান্তে 'নী, ইনী, বাম্‌নী, কায়েতনী, বদ্দিনী, বাগদিনী, ডোমনী, হাড়িনী, সাঁওতালনী, পুরুতনী, ধোবানী, নাপতিনী, কামারনী, কুমোরনী, তাঁতিনী, দর্জিনী' সবগুলি শব্দই হ্রস্ব-ইকারান্ত করলে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সুপরিস্ফুট হত। সম্পাদকেরা একটু সতর্ক হতে পারতেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, "রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে যেমন পেয়েছি, তেমনই ছেপেছি।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো একাধিকবার ঘোষণা করেছেন তিনি নিয়মের কথাই বলতে পারেন, অভ্যাস সব

সময়ে বদলানো সম্ভব হয় না। তা ছাড়া, সম্পাদকেরা রবীন্দ্র-হস্তাক্ষর দেখেই কি বই ছাপেন? গ্রন্থাবলীতে বহু বানান আছে যা রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে কোথাও পাওয়া যাবে না। শব্দগুলির বানান যদি সর্বত্র একরকম হত আমরা ধরে নিতাম, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ হয়তো নূতন কোন প্রণালী অবলম্বন করেছেন। গ্রন্থন-বিভাগের বহু বানান রবীন্দ্রসূত্রসম্মত নয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতির অনুমোদিতও নয়। আমরা বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতা পড়েছি। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে 'পূজারিণী' কোথাও 'পূজারিনী', কোথাও 'পূজারিনি'। তিন বানানই কি কবির হস্তাক্ষরে পাওয়া যাবে? এই প্রসঙ্গে আমাদের অন্য এক জিজ্ঞাসাও থাকল— 'পূজা' শব্দের প্রাকৃত রূপ যখন রবীন্দ্ররচনাবলীতে সর্বত্র 'পুজো' হয়ে গেছে, তখন 'পূজারিনি'-ই বা 'পুজারিনি' নয় কেন? যে-শব্দে 'ণী'-র 'নি' হতে বাধা নেই সে-শব্দে 'পূ'-র অস্তিত্ব কী করে সম্ভব?

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে 'খৃষ্ট' বানান দেখেছি। সংস্কার-সমিতির বিধান 'খ্রীষ্ট'। কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলীতে 'খৃষ্ট, খৃস্ট, খ্রীষ্ট, খ্রীস্ট' চার বানানই শোভা পাচ্ছে, 'খ্রিস্ট' আছে কিনা জানি না। আধুনিক লেখকেরা লেখেন 'খ্রিস্ট'।

সংস্কৃতে একটা শব্দের বানান পেয়েছি আটরকম—'ভ্রুকুটি ভ্রুকুটী ভ্রূকুটি ভ্রূকুটী ভৃকুটি ভৃকুটী ভ্রকুটি ভ্রকুটী'। মনে হচ্ছে 'খ্রীস্ট' শব্দ এই ভ্রুকুটি-রই দোসর।

আমাদের হাতের কাছে 'গীতাঞ্জলি'তে প্রকাশিত পাঁচটি কবিতার রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে পাণ্ডুলিপির চিত্র আছে। বিভিন্ন সংস্করণের ছয়খানি গীতাঞ্জলি, দুইখানি সঞ্চয়িতা এবং দুইখানি বিশ্বভারতী-রচনাবলীর পাঠ মেলাতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেছি। বানানে, ছেদচিহ্নে—পাণ্ডুলিপির সঙ্গে দূরের কথা, মুদ্রিত গ্রন্থের একখানির সঙ্গে অন্যখানির বহুলাংশে অমিল। কোন-দুইখানি গ্রন্থে বানান, ছেদচিহ্ন সর্বাংশে এক পাই নি। গীতাঞ্জলির প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ সালে। ১৩১৭ সালের পালিপিইগু

দেখেছি। প্রুফ-সংশোধনকালে কবি বানান-ছেদচিহ্নের কিছু কিছু পরিবর্তন করে থাকবেন। সাতবার ছাপা হওয়ার পরে বিশ্বভারতী-সংস্করণ হয় ১৩৩৪ সালে। ধরে নেওয়া যাক, এ সংস্করণেও কবি প্রুফ সংশোধন করেছেন। ১৩৩৭ সালেও কি কবি আট বার ছাপা পুরানো বই-এর প্রুফ দেখেছেন? ১৩৪৮ সালে কবির তিরোধান। দেহান্তের পরে আর তাঁর প্রুফ দেখা সম্ভব নয়। ১৩৩৭ সালের গীতাঞ্জলি ও ১৩৭৫ সালের গীতাঞ্জলি থেকে একটিমাত্র কবিতার বানান-বৈষম্য দেখাচ্ছি—ছেদচিহ্নের কথা তুলছিই না, যদিও কবির দেওয়া ছেদ-চিহ্ন পরিবর্তন করার অধিকার কারও আছে বলে মনে করি না।

১০৮ নং কবিতা—

১৩৩৭···অপমানে হোতে হবে
১৩৭৫··· " হতে "

১৩৩৭···ধূলায় সে যায় বয়ে
১৩৭৫···ধুলায় " " বয়ে—

১৩৩৭···যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে
১৩৭৫··· " " নীচে ফেল' " " " " নীচে,

১৩৩৭···শতেক শতাব্দী ধ'রে
১৩৭৫··· " " ধরে

১৩৩৭···তবুও করো না নমস্কার
১৩৭৫··· " কর " "

১৩৩৭···সবারে না যদি ডাকো,
এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো
১৩৭৫··· ··· ··· ডাক'
··· ··· থাক'
··· ··· রাখ'

বানান-ছেদচিহ্নে তো বৈষম্য আছেই, শব্দ-ব্যবহারেও বৈষম্য আছে। ১০৬ নং কবিতা—

পাণ্ডুলিপি···পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
১৩৩৭···পশ্চিমে " " "
১৩৭৫···পশ্চিম " " "

পাণ্ডুলিপি···যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার
১৩৩৭······ " " " "
১৩৭৫······যজ্ঞশালার " " "

এই কবিতায়ও বানান-ছেদচিহ্নে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে কিংবা মুদ্রিত এক গ্রন্থের সঙ্গে অন্য গ্রন্থের অমিল প্রচুর।

সব ছেড়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ করছি এই জন্য যে আমরা সাধারণ পাঠক মনে করি রবীন্দ্ররচনাবলীতে যে বানান পাওয়া যাবে তা সবই রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত বানান। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-স্বত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের সাধারণ প্রকাশকের মতো দায়িত্বহীন হওয়া চলে না।

ইকার-উকার অধ্যায়ে তদ্ভব শব্দের বানানই একমাত্র সমস্যা নয়। সমাসবদ্ধ খাঁটি সংস্কৃত শব্দের বানানেও বিভ্রান্তি আছে। গুণিগণ না গুণীগণ? স্বামিসেবা না স্বামীসেবা? পক্ষিতত্ত্ব না পক্ষীতত্ত্ব? মন্ত্রিপর্যায়ে না মন্ত্রীপর্যায়ে? প্রশ্নটি সংক্ষেপে এই—বাংলায় মূল শব্দ 'গুণিন্, স্বামিন্, পক্ষিন্, মন্ত্রিন্' না 'গুণী, স্বামী, পক্ষী, মন্ত্রী'? সংস্কার-সমিতি এপ্রসঙ্গে নীরব। রবীন্দ্রনাথেরও এপ্রসঙ্গে কোন বিধান আছে কিনা জানি না। এই বানান নিয়ে কিছু চিন্তা করেছিলেন সেযুগে 'প্রবাসী'র চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলতেন বাংলায় মূল শব্দ ইন্ ভাগান্ত নয়, অতএব বানান হবে 'মন্ত্রীগণ মন্ত্রীপুত্র মন্ত্রীসভা'।

কিছুকাল আগে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে 'ভারতকোষ' প্রকাশিত হয়েছে। দেশের গণ্যমান্য পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিত নিষ্ঠাবান্ যুবকেরা মিলে এই গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন। আশা করেছিলাম এই

গ্রন্থে 'ইন্‌-ঈ'র গ্রন্থিমোচন হবে। দুঃখের বিষয় এঁরা সমস্যার দিকে নজর দিলেও জটিলতা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ভারতকোষ বলছেন:

"তৎসম শব্দে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসৃত হইলেও স্থলবিশেষে ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছু কিছু ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। সমাসের পূর্বপদস্থিত ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ পরিচিত ক্ষেত্রে ই-কারান্ত না হইয়া ঈ-কারান্ত হইয়াছে, যথা 'যোগীগণ', 'মন্ত্রীসভা', 'অনুগামীগণ' ইত্যাদি।"

'পরিচিত ক্ষেত্রে' মানে কী? 'যোগীগণ' যদি চলে 'যোগীশ্রেষ্ঠ' চলবে? 'যোগীবর, যোগীরাজ, যোগীবেশ' চলবে কিনা বুঝি না। সম্পাদকমণ্ডলীতে একটি নাম আছে 'শশিভূষণ'—অর্থাৎ 'শশীভূষণ' চলবে না। 'শশীমোহন, শশীপদ, শশীমুখী, শশীসম, শশীনিভ, শশীসুলভ, শশীদেহ, শশীকলা, শশীভানু, শশীসূর্য, শশীতারকা, শশীপ্রীতি, শশীকর' —এই শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টা চলবে, কোন্‌টা চলবে না বুঝি না। কোন্‌ শব্দ পরিচিত? এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশ দরকার। কেউ কেউ বলেন, সমাসটা বাংলায় তৈরী হয়েছে, না, সংস্কৃতেই পূর্বে ছিল সেইটি দেখে সিদ্ধান্ত করতে হবে। সেটা যে সহজ নয় তাই বোঝাবার জন্যই 'শশী' বা 'শশিন্‌' শব্দ-যোগে কয়েকটি সমাসের উল্লেখ করলাম।

বৈদেশিক শব্দের বেলা বানান-সংস্কার-সমিতি বিধান দিয়েছেন:

"মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়; যথা—সীল (seal), ঈস্ট (east), ঊস্টার (Worcester), স্পূল (spool)।"

—(১৫নং নিয়ম)

নিয়মটি তো খুবই ভাল। মুশকিল হচ্ছে—প্রবীণ বা নবীন কোন সাহিত্যিকই এই নিয়ম মেনে চলছেন না। সংস্কার-সমিতির বিধান-দাতারাও কি এই নিয়মের উপর কোনপ্রকার গুরুত্ব দিয়েছেন? ইংরেজী Tea শব্দের উচ্চারণ 'টী'। সমিতির চতুর্থ নিয়মে হস্‌-বর্জন

প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেখেছি 'টি-পট'। এটা কি 'টী-পট' হওয়া উচিত ছিল না? এই নিয়ম মানতে গেলে অধিকাংশ ইংরেজী শব্দে দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊকারের ছড়াছড়ি দেখা যাবে। এসব কি সহ্য হবে? সমিতি 'spool'-এর উদাহরণ না দিয়ে সকলের পরিচিত শব্দ 'school'-এর উদাহরণ দিলে নিয়মটা কতটা আন্তরিকতা সহকারে রচিত হয়েছে আমরা বুঝতে পারতাম। B, C, D, E, P, T অক্ষরগুলিকে ক'জন লেখক বী, সী, ডী, ঈ, পী, টী লিখতে অগ্রসর হয়েছেন? B. A., B. T.-কে যদি বী. এ., বী. টী. লিখি, কিংবা C. P. I.-কে সী. পী. আই. লিখি, চক্ষু স্থির হবে না তো?

সংস্কার-সমিতির ষষ্ঠ নিয়ম ঃ

"জ য। এইসকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—'কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল'।"

এইসকল শব্দে কেন জ লিখব, সেসম্বন্ধে কোন নির্দেশ নেই। মনে হচ্ছে 'কার্য্য, যবাগূ, যন্ত্র, যন্ত্রী, যূথিকা, যুক্ত, যোগ, যোজিত, যুগ্ম বা যুক্ত, যোত্র বা যোক্ত্র, যুগল' শব্দগুলির য সদস্যদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। এ শব্দগুলি যে সংস্কৃত! সংস্কৃত তো ভাষার জননী নয়, ভাষার ধাত্রীমাত্র! ধাত্রীকে আর ক'দিন মাতৃসম্মান দেওয়া যায়! আমাদের নিকট-আত্মীয় প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃতে য নেই, আছে জ, অতএব জ লেখাই সমীচীন। শুধু কি তাই? আমরা উচ্চারণ করি কী? য? অর্থাৎ য়? কখনও নয়, আমরা উচ্চারণ করি বিশুদ্ধ জ। এইসব কারণেই য-এর নির্বাসন এবং জ-এর প্রতিষ্ঠা। এইবার মনে পড়েছে কেন সুনীতিকুমার 'যাওয়া' লিখতে বর্গ্য-জ লাগাতে চেয়েছিলেন। শুনেছি, সংস্কার-সমিতিতে তিনি প্রস্তাবও দিয়েছিলেন—'যদ্' শব্দজ যাবতীয় শব্দ বাংলায় বর্গ্য-জ দিয়ে

লেখা উচিত। কারণ এদের উচ্চারণেও জ, মূলেও জ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায়ও জ, আর প্রাচীন বাংলা পুঁথিতেও জ।

আমাদের আশঙ্কা—কোন যুক্তিই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা চলে না।

বাংলা উচ্চারণে 'জ' 'য'-এ অভেদ। বাংলায় বর্গীয়-জ ও অন্তঃস্থ-য উচ্চারণে লেশমাত্র ধ্বনি-পার্থক্য নেই। 'যে, যিনি, যাহা, যাহার, যাহাকে' শব্দগুলির উচ্চারণে 'জ'-ধ্বনি ঠিকই, কিন্তু সংস্কৃত 'যক্ষ, যম, যজন, যজুঃ, যজ্ঞ, যত্ন, যন্ত্র' শব্দগুলিতেও আমরা বাংলায় 'জ'-উচ্চারণই করে থাকি, কদাপি 'য়ক্ষ' 'য়ম' 'য়জন' বলি না। সংস্কৃত শব্দই যদি বিকৃত উচ্চারণে বলতে পারি, পড়তে পারি, বাংলা শব্দ পারব না? উচ্চারণের যুক্তি টেকে না। অন্যত্র নবম নিয়মে 'ঙ, ং'-এর উচ্চারণ-প্রসঙ্গে সমিতিও স্বীকার করেছেন "প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান।"

প্রাচীন পুঁথিতে 'জ'? প্রাচীন পুঁথিতে 'যদি, যত্ন, যুদ্ধ, যথা' প্রভৃতি খাঁটি সংস্কৃত শব্দেও 'জ' বানান পাওয়া যায়। লিপিকর-প্রমাদকে প্রাচীন বানান বলা চলে না।

অতঃপর সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি—এইসব শব্দের মূল প্রাকৃত ভাষা। ঠিক। কিন্তু প্রাকৃত ভাষা আছে কতরকম? 'প্রাকৃত-চন্দ্রিকায়' পণ্ডিত শেষচন্দ্র বলছেন, 'প্রাকৃত' সাতাশ রকম। কেউ বলছেন আঠারো, কেউ বলছেন ছয়। প্রাকৃতের সর্বাপেক্ষা কম উপবিভাগের নাম করেছেন বররুচি। বররুচি চতুর্বিধ প্রাকৃতের নাম দিয়েছেন—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী। এই চার প্রাকৃতের মধ্যে কার সঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?

ভাষাচার্যের ভাষাই উদ্ধৃত করি:

"খুব সম্ভব আমাদের বাঙলাদেশে তখন যে আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল—সেই ভাষা ছিল এই মাগধী-ই। তখন অবশ্য আমাদের এই বর্তমান বাঙলা ভাষা, বা যে ভাষা প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে পাই, সে ভাষার উদ্ভব হয় নি। এই মাগধী-প্রাকৃতের মধ্যে উচ্চারণ-গত

একটী বিশেষত্ব ছিল, যা এর দৌহিত্রী-স্থানীয় বাঙলা এখনও রক্ষা ক'র্ছে—সেটী হ'চ্ছে ভাষার 'শ ষ স'-স্থানে কেবল 'শ'।"

–বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২২

মাগধী ভাষায় কেবল 'শ' সম্বন্ধে 'ষসোঃ শঃ' নয়, 'য' সম্বন্ধেও বিধি—"জো যঃ। মাগধ্যাং জকারস্য যকারো ভবতি। জায়তে > যাঅদে।" মাগধী ভাষায় জ-এর স্থান নেই। সবই য। মাহারাষ্ট্রী বা শৌরসেনীতে পদের আদিস্থিত য-কার জ-কার হয় বটে (পদমধ্যস্থ অযুক্ত 'জ, য' উভয় বর্ণই প্রায়শঃ লুপ্ত হয়), কিন্তু মাগধীতে 'জ'-ও 'য' হয়ে যায়। ছেলেবেলায় আমাদের শেখানো হত 'কার্য্য'-স্থলে 'কায' হবে না, হবে 'কাজ', কারণ বাংলা শব্দটি প্রাকৃত 'কজ্জ' থেকে উৎপন্ন। কিন্তু 'পৈশাচী'-ও তো প্রাকৃত। পৈশাচীতে 'কার্য্য' শব্দ দিয়েই দৃষ্টান্ত রচনা করা হয়েছে 'কার্য্যম্ > কচ্চম্'। প্রাকৃত অবলম্বনে 'কাচ' লেখা চলবে? আবার 'মাতামহী' মাগধীতেও 'কার্য্য' শব্দের দৃষ্টান্ত সহ জ-য সম্বন্ধে আরও একটা সূত্র পাচ্ছি 'র্যজয়ো র্য্যঃ'। "মাগধ্যাং র্যকারর্জকারয়োঃ স্থানে য্যো ভবতি। কার্য্যম্ > কয্যে। দুর্জ্জনঃ > দুয্যণে।" মাতামহীকে অবহেলা করে তাঁর ভগিনীদের দেশে কেন যাব? প্রাকৃতের ধুয়া তুললে 'কায' বানানই সঙ্গত। তবে আমাদের বক্তব্য—'কাজ' যখন বর্তমান বাংলায় একেবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে, একে নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া করা উচিত হবে না। কিন্তু সংস্কৃত মূলে 'য' আছে এমন যেসমস্ত তদ্ভব বা অর্ধ-তৎসম শব্দে 'জ' এখনও দৃঢ়ীভূত হয় নি সেসমস্ত শব্দে 'য' রাখাই সমীচীন। 'জাঁতা, জো, জোড়া' অপেক্ষা 'যাঁতা, যো, যোড়া' অনেক ভাল। তাতে মাতামহীরও পরিচয় থাকে, আর প্রমাতামহীরও স্মৃতি থাকে (মাতামহীর মাতাকে কী বলা হয় জানি না, তাই মাতামহর মাতাকেই স্মরণ করলাম)। 'যাঁতা, যো, যোড়া' যদি অস্পৃশ্য মনে হয়, তবে এখনও 'যতন, যাতনা, যাচাই, যাচানো, যোঝা (<যুধ্)' চলছে কী করে? 'যদ্' শব্দজ বা 'যা' ধাতুজ বাংলা শব্দগুলিই বা রূপান্তরিত হয় নি কেন? বৈদেশিক শব্দ

Jesus-কেই বা 'যীশু' লেখা হচ্ছে কেন? না কি এবার হিব্রু Yehoshua-র আনুগত্য স্বীকার করা হচ্ছে? তাজ্জব! সংস্কৃত-মূল সহ্য হয় না, হিব্রু-মূলে আপত্তি নেই!

সংস্কার-সমিতির সপ্তম বিধান—ণ ন:

"অসংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হইবে; যথা—কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার, কার্নিস। কিন্তু যুক্তাক্ষর 'ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ' চলিবে; যথা—ঘুন্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা। 'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।"

সুনীতিকুমারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'রানী'তে বিকল্প কেন। সুনীতিবাবু বললেন, "নচেৎ পণ্ডিতমশায়রা আত্মহত্যা করতেন।" মনে হয় পণ্ডিতমশায়দের আত্মহত্যার ভয়েই 'যদ্' শব্দজ বাংলা শব্দগুলিও বেঁচে গেছে। আর পণ্ডিতমশায়রা আত্মহত্যার জন্য এতটাই প্রস্তুত হয়েছিলেন যে 'যাওয়া' শব্দে বর্গ্য-জ লাগাবার প্রস্তাবই উত্থাপিত হতে পারে নি। পণ্ডিতমহাশয়দের ধন্যবাদ দিতে হবে।

'ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ'-কে যে সমিতি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন, তা নিশ্চয়ই মুদ্রাযন্ত্রকে মনে এনে। কিন্তু phonetician লেখকদের কি নিরস্ত করা যাবে? তাঁরা লিখছেন 'ন্‌ট, ন্‌ঠ, ন্‌ড, ন্‌ঢ'। 'লুণ্ঠন' চলে কিন্তু 'লণ্ঠন' চলে না—এঁরা লিখছেন 'লন্‌ঠন'। 'ণ্ঠ' এবং 'ন্‌ঠ'তে উচ্চারণ-পার্থক্য আছে নাকি?

এখন দেখা যাক 'অসংস্কৃত শব্দে কেবল ন' কেন। সেই সনাতন যুক্তি—বাংলা উচ্চারণে মূর্ধন্য-ণ নেই, প্রাচীন বাংলায় দন্ত্য-ন লেখা হয়েছে। এবার 'প্রাকৃত'র দোহাইটা নেই কারণ 'মাগধী, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী'তে কোথাও দন্ত্য-ন নাক গলাতে পারে নি, তিন প্রাকৃতেই মূর্ধন্য ণ-এর রাজত্ব। দন্ত্য ন-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 'পৈশাচী'তে—কিন্তু পণ্ডিতেরা অন্ততঃ এই সময়ে পৈশাচী রাজ্যে প্রবেশ করলেও পিশাচদের প্রভুত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত, যদিও 'স্ট' লেখার বেলা অজ্ঞাতসারে 'পৈশাচী সূত্র' গ্রহণ করে ফেলেছেন। সে-কথা যথাস্থানে বলা যাবে।

প্রাচীন বাংলা পুঁথির যুক্তি অচল, একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ-বিকার? এখানে পণ্ডিতমহাশয়েরা সকলে একমত। অতএব 'মাগধী, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী'র বাধাসত্ত্বেও কেবল উচ্চারণের অপরাধেই মূর্ধন্য ণ-এর শিরশ্ছেদ। কিন্তু দন্ত্য ন-এর উচ্চারণই কি বাঙ্গালী রসনায় খাঁটি? আমাদের সংশয় আছে, বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন।

উচ্চারণের যুক্তি তোলা যে বিপজ্জনক তা পূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে। আরও কয়েকবার না বলে উপায় নেই। ভুল উচ্চারণের জন্য আমরা 'কর্ণ, বর্ণ, ঋণ, তৃণ, প্রণাম, পরিণাম' প্রভৃতি শব্দ বাংলা ভাষা থেকে উচ্ছেদ করতে পারব না, তাদের ভুল উচ্চারণেই পড়তে হবে। ভুল উচ্চারণ যখন এড়াতে পারছিই না, তখন ভুল জেনেও কিছু কিছু অতৎসম শব্দে আমরা মূর্ধন্য-ণকে মেনে নিতে পারতাম—সংস্কার-সমিতি যেমন ভুল উচ্চারণসত্ত্বেও 'ঙ, ং'-কে মেনে নিয়েছেন।

বিদেশী শব্দের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। তদ্ভব শব্দেও মূর্ধন্য-ণ চলছে না। তদ্ভব দূরের কথা, ভগ্নতৎসম শব্দেও ণ এক বিভীষিকা। 'বর্ণ>বরন, প্রাণ্>পরান, বর্ষণ>বরিষন, কাণ>কানা, কোণ>কোনা, দক্ষিণ>দক্ষিনা, পুণ্য>পুন্যি, মাণিক্য>মানিক'—এসমস্ত শব্দেও মূর্ধন্য-ণ অচল হয়ে গেছে। আমরা মনে করি অন্ততঃ এই শ্রেণীর শব্দগুলিতে মূর্ধন্য-ণ থাকলে শব্দের পরিচয় বিঘ্নিত হত না। মূর্ধন্য-ণ এতই বিরক্তিজনক মনে হয়েছে যে 'গণনা করা' অর্থে সংস্কৃতে 'গণ্' ধাতু থাকলেও বাংলায় আর-একটা 'গন্' ধাতুর সৃষ্টি হয়েছে। 'চল্লিশসের' অর্থে—'মণ' শব্দে আধুনিক বানানে দন্ত্য-ন দেওয়া হচ্ছে কেন? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস শব্দটিকে অর্বাচীন সংস্কৃত বলে স্বীকার করেছেন। দেবপ্রসাদবাবু বলছেন, "ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত 'লীলাবতী'তেও ওজন-বাচক 'মণ' বানানই আছে; যথা, মণাভিধানং খষুগৈশ্চ সেরৈঃ।" খাঁটি সংস্কৃত শব্দও আমাদের হাতে রেহাই পাবে না।

'প্রবহমান' শব্দটি বাংলা ভাষায় খুব চলেছে। সংস্কৃত ণত্ব-বিধান

স্বীকার করলে শব্দটিতে 'ন' চলে না, হওয়া উচিত 'ণ'। কিন্তু এটা নাকি সংস্কৃত ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ শব্দ, অতএব এটা আর তৎসম শব্দ থাকল না, ফলে মূর্ধন্য-ণ পলায়ন করেছে। হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত ব্যাকরণ-কৌমুদীতে 'কৃত্যচঃ' সূত্রে 'প্রবহমাণ' উদাহরণ আছে। একাধিক বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধানে 'প্রবহমাণ' বানান আছে। কিন্তু সংস্কৃত 'প্রাদ্বহঃ' সূত্রে বলা হয়েছে 'প্র-পূর্বক বহ্ ধাতুর পরস্মৈপদ হয়' অর্থাৎ বৈয়াকরণ-দ্বন্দ্বে সংস্কৃতে 'প্রবহমাণ' শব্দ অস্বীকৃত। ভাল কথা। বাংলায়ও ব্যাকরণসম্মত 'প্রবহৎ' বা 'বহমান' লিখলেই চলে। তবে গালভরা 'প্রবহমান' শব্দ না হলে যদি রচনা অচল হয়, আমরা তো মনে করি মূর্ধন্য-ণ দেওয়াই সঙ্গত; ডবল ভুল করে লাভ কী?

হালে দুটি নূতন শব্দ পাচ্ছি 'রবীন্দ্রায়ণ, অবনীন্দ্রায়ণ'। এই দুইটি শব্দে কিন্তু মূর্ধন্য-ণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন্ সূত্র অনুসারে? সংস্কৃতে যে সূত্র আছে তার মধ্যে এই দুই শব্দে মূর্ধন্য ণ-এর স্থান নেই। সংস্কৃত সূত্র 'অয়নঞ্চ'। ব্যাকরণ-কৌমুদীতে এর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে 'পর, পার, উত্তর, চান্দ্র, রাম, নার বা নারা' শব্দের পরবর্তী 'অয়ন' শব্দের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। তার মানে যে-কোন শব্দের পরে 'ঋ র ষ'-এর প্রভাবে 'অয়ন'-এর দন্ত্য বর্ণ রূপান্তরিত হয় না।

অতএব সংস্কৃত প্রভাবকে কোথায় কীভাবে কতটুকু স্বীকার করা হবে, সেটা ধীরভাবে বিচার করা দরকার।

তা বলে আমরা অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা দেবপ্রসাদ ঘোষের প্রস্তাবমতো 'বাণান, কাণ, পাণ, সোণা, চূণ' জাতীয় শব্দে মূর্ধন্য-ণ মেনে নিতে পারি না। সংস্কৃত শব্দগুলিতে ণ-এর হেতু পূর্বস্থিত রেফ—বর্ণন, কর্ণ, পর্ণ, স্বর্ণ, চূর্ণ। 'ঋ র ষ'-এর প্রভাব না থাকলে সংস্কৃত ভাষাতেও কোন শব্দে মূর্ধন্য-ণ'এর স্থান হয় না। অকারণে মূর্ধন্য-ণ সংস্কৃতেও চলে না (স্বাভাবিক ণ ব্যতীত), বাংলায়ও চলবে না।

বৈদেশিক শব্দে ণত্ব-বিধান আমরা সমর্থন করি না, কিন্তু মূর্ধন্য-ণ

যখন বাংলা বর্ণমালার অঙ্গীভূত, এবং সমস্ত তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দ একই শ্রেণীর নয়, তখন কিছু কিছু অসংস্কৃত শব্দেও মূর্ধন্য-ণ রাখা সঙ্গত মনে করি। শব্দের বানানে কেবল ধ্বনিগত শুদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না, বানানের প্রধান কাজ হচ্ছে শব্দের অর্থ প্রকাশ করা। এজন্য তদ্ভব বা অর্ধ-তৎসম শব্দের বানান হওয়া উচিত যথাসম্ভব সংস্কৃত মূলানুযায়ী। হ্রস্ব-দীর্ঘ, জ-য, ণ-ন—সর্বক্ষেত্রেই আমাদের এই অভিমত।

সংস্কার-সমিতির অষ্টম নিয়ম—"ও-কার, ঊর্ধ্বকমা।—সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার বা ঊর্ধ্ব-কমা যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; মত, মতো ; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)।"

আবার সেই 'সুপ্রচলিত শব্দ' এবং বিকল্প-বিধান। সূত্রটি দেখে মনে হচ্ছে, সংস্কার-সমিতি ও-কার কিংবা ঊর্ধ্ব-কমার প্রয়োগ যথাসম্ভব বর্জন করতে চান। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবেই ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমার বিধি। উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—'কাল, কালো ; ভাল, ভালো'। 'ভাল'-ও যদি 'সুপ্রচলিত শব্দ' না হয়, তবে সুপ্রচলিত শব্দ কাকে বলে ? 'ভাল' শব্দেও বিকল্পে ও-কার বিহিত হচ্ছে। কেন ? 'উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ' বোঝাতে কি ও-কার অত্যাবশ্যক ? 'ভাল' শব্দের দুটি অর্থ জানি—বিশেষ্য 'কপাল' এবং বিশেষণ 'উত্তম'। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটি বাক্যও চোখে পড়ে নি যেখানে 'ভাল' শব্দের অর্থগ্রহণে বাধা পেয়েছি। সংস্কার-সমিতি যদি মনে করে থাকেন 'উত্তম' অর্থে 'ভাল' অপেক্ষা 'ভালো' বানানই ভাল, অক্লেশে বলা যেতে পারত 'ভাল' নয়, 'ভালো' লিখতে হবে। বিকল্প-বিধান কেন ? 'কাল, কালো' সম্বন্ধেও আমাদের একই মন্তব্য। কিন্তু 'সদৃশ' অর্থে 'মতো' বানানই আমরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি,

কারণ ও-কার না থাকলে কখন কখন 'অভিমত' অর্থের সঙ্গে বিভ্রান্তি ঘটে।

"পড়ো, প'ড়ো" ক্ষেত্রেও ঊর্ধ্ব-কমা বাঞ্ছনীয়। আর 'পড়ুয়া' অর্থে 'পোড়ো'র চেয়ে "প'ড়ো" যে অনেক ভাল তা-ও আমরা স্বীকার করি। বিকল্প-বিধান দেওয়ার জন্য বোধ হয় সংস্কার-সমিতি অধিকতর দৃষ্টান্ত বা আলোচনা অনাবশ্যক মনে করেছেন। তবে এর পরেও অন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

"এইসকল বানান বিধেয় 'এত, কত, তত, যত ; তো, হয়তো ; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)'।"

খুবই সঙ্গত প্রস্তাব—আমরা পূরাপূরি সমর্থন করি। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিকেরা লিখছেন 'এতো, কতো, ততো, যতো'। পূর্বতন লেখকেরা দূরের কথা, ও-কার-প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথও কোন দিন এই শ্রেণীর শব্দে ও-কার প্রয়োগ করেন নি। আবার 'তো, হয়তো' আধুনিকেরা স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্র-রচনাবলীতে স্থানে স্থানে 'হয়ত'-র সাক্ষাৎ পাই। 'কাল, চাল, ডাল'-এ অধুনা কোন বিরোধ নেই। বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র রায় 'কল্য, চাউল, দাইল' অর্থে একটা নূতন আ-কার (ৗ) সৃষ্টি করে লিখতেন 'কৗল, চৗল, ডৗল।' তবে তিনি ছাড়া আর কেউ এই নূতন আ-কারে লিখেছেন বলে জানি না।

ও-কার এবং ইলেক (ঊর্ধ্ব-কমা) প্রসঙ্গ ক্রিয়া-বিভক্তি আলোচনায় আবার আবশ্যক হবে, অতএব এ আলোচনা এখানেই ছেড়ে দিচ্ছি। তবে সংস্কার-সমিতির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ পুস্তিকায় আরও কিছু কিছু আলোচনা ছিল যা তৃতীয় সংস্করণে বর্জন করা হয়েছে। তার একটা প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করি :

"কোন, এখন, কখন, তখন প্রভৃতি শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগে এইরূপ

বানান বিধেয়; যথা—কোন্ লোক? কোন কোন লোক বর্ণান্ধ; কোনও লোক আসে নাই; কখন্ হইবে জানি না; কখন মেঘ কখন রৌদ্র; এমন কখনও হয় না।"

—খুবই যুক্তিসঙ্গত নিয়ম করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের 'কোনো, এখনো, কখনো, তখনো' বানানকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যই তৃতীয় সংস্করণে এই নিয়ম পরিত্যক্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি, তাহারি, এখনি, তখনি, তোমারো, তাহারো, এখনো, তখনো' বানান সে-যুগের রক্ষণশীল পণ্ডিতবর্গের হাস্যোদ্রেক করেছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, 'তার + ই = তারি, আজ + ও = আজো' হতে পারলে 'ভাত + ই = ভাতি, মাছ + ও = মাছো' হবে না কেন। আমাদের ধারণা ক্ষেত্রবিশেষে সর্বনাম ও অব্যয় পদের সঙ্গে 'ই, ও' যোগে এই জাতীয় সন্ধি রবীন্দ্র-পূর্ব কবিরাই করে গেছেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমারি, তোমারি, আজো, আরো' প্রভৃতি বানানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবে তাঁরা বোধ হয় কেবল পদ্যেই, এবং সর্বনাম ও অব্যয় পদের মধ্যেই, এই শ্রেণীর বানান সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরিধি বাড়িয়ে সম্বন্ধপদেও (আনন্দেরি, জীর্ণতারি)* এই বানান টেনে এনেছেন এবং সর্বনাম বা অব্যয় পদের 'তোমারি, তারি, কখনো, তখনো' গদ্যেও ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা ঘাতসহ বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

> "বাংলা শব্দে কতকগুলি মুদ্রাভঙ্গী আছে। ভঙ্গী-সঙ্কেত যেমন অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদে যুক্ত এগুলিও তেমনি। যে মানুষ রেগেছে তার হাত থেকে ছুরিটা নেওয়া চলে, কিন্তু ভ্রূর থেকে ভ্রূকুটি নেওয়া যায় না। যেমনি, তখনি, আমারো, কারো, কোনো, কখনো শব্দে ই-কার এবং ও-কার কেবলমাত্র ঝোঁক দেবার

* প্রাচীন সাহিত্যেও এই বানান পাওয়া যায়।

জন্যে। ওরা শব্দের অনুবর্তী না হয়ে, যথাসম্ভব তার অঙ্গীভূত থাকাই ভালো।" .

(প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৪)

উদাহরণগুলির মধ্যে 'কারো' এবং 'কোনো' শব্দও আছে। দুটিই ভিন্ন জাতীয় শব্দ—অন্যান্য শব্দের সঙ্গে এই দুটি শব্দের মিল নেই। 'কোন' শব্দ অ-কারান্ত। 'তখন' শব্দের সঙ্গে 'ই' যোগ করলে 'তখনি' হয়, কিন্তু 'কোন' শব্দের সঙ্গে 'ই' যোগ করলে 'কোনি' হয় না—লিখতে হবে 'কোনই'। 'কোন' শব্দের সঙ্গে 'ও' যোগ করলে হবে 'কোনও', 'অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদে' 'কোনো' লেখার কোন যুক্তি নেই। 'কার' শব্দের সঙ্গে 'ও' যোগ করলে 'কারো' লেখা যায় বটে, কিন্তু 'ই' যোগ করে 'অবিচ্ছেদে' 'কারি' লেখা যায় না। অতএব এই দুটি শব্দে অন্ততঃ এই 'মুদ্রাভঙ্গী' এবং 'অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদে যুক্ত' রাখার যুক্তি অচল।

'ভাত + ই = ভাতি, মাছ + ও = মাছো' ব্যঙ্গের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"এখনি তখনি আমারো তোমারো শব্দের ই-কার ও-কারকে ঝোঁক দেবার কাজে ইঙ্গিতের মধ্যে গণ্য করে ওদুটোকে শব্দের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রস্তাব করেছিলেম। তার প্রতিবাদে আপনি পরিহাসের সুরে বলেছেন, তবে কি বলতে হবে, আমরা ভাতি খাই রুটি খাই নে। দুটো প্রয়োগের মধ্যে যে প্রভেদ আছে সেটা আপনি ধরতে পারেন নি। শব্দের উপরে ঝোঁক দেবার ভার কোনো-না-কোনো স্বরবর্ণ গ্রহণ করে। যখন আমরা বলতে চাই, বাঙালি ভাতই খায় তখন ঝোঁকটা পড়ে আ-কারের পরে, ই-কারের পরে নয়। সেই ঝোঁকবিশিষ্ট আ-কারটা শব্দের ভিতরেই আছে স্বতন্ত্র নেই। এমন নিয়ম করা যেতে পারত যাতে ভাত শব্দের ভা-এর পরে একটা হাইফেন স্বতন্ত্র চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হোতো—যথা বাঙালি ভা-তই

খায়। ই-কার এখানে হয়তো অন্য কাজ করচে, কিন্তু ঝোঁক দেবার কাজ তার নয়। তেমনি 'খুবই' শব্দ, এর ঝোঁকটা উ-কারের উপর। যদি 'তীর' শব্দের উপর ঝোঁক দিতে হয়, যদি বলতে চাই 'বুকে তীরই বিঁধেছে' তাহলে ঐ দীর্ঘ ঈ-কারটাই হবে ঝোঁকের বাহন। দুধটাই ভালো কিম্বা তেলটাই খারাপ এর ঝোঁকগুলো শব্দের প্রথম স্বরবর্ণেই। সুতরাং ঝোঁকের চিহ্ন অন্য স্বরবর্ণে দিলে বেখাপ হবে। অতএব ভাতি খাব বানান লিখে আমার প্রতি লক্ষ্য করে যে-হাসিটা হেসেছেন সেটা প্রত্যাহরণ করবেন। ওটা ভুল বানান, এবং আমার বানান নয়। বলা বাহুল্য 'এখনি' শব্দের ঝোঁক ই-কারের পরে, খ-এর অ-কারের উপরে নয়।"

(দেবপ্রসাদ ঘোষের নিকট ২৯ জুন ১৯৩৭-এ লেখা চিঠি)

কবি বলছেন, 'ভাতি' বানান হবে না, কারণ "ঝোঁকটা পড়ে আ-কারের পরে, ই-কারের পরে নয়"। কিন্তু যখন লেখা হয়—

"তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে"

তখন 'তারি' শব্দের ঝোঁকটা পড়ে আ-কারের পরে, কি ই-কারের পরে? আ-কারের পরে হলে 'তারি' বানান চলবে না, লিখতে হবে 'তারই'। যদি বলা হয় ঝোঁকটা ই-কারের পরে, তা হলে প্রশ্ন করতে পারি—'তারি লাগি'? 'কারি লাগি'?

সংস্কার-সমিতির নবম নিয়ম—"ঙ্গ ং ঙ।—'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই চলিবে। হসন্তধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'। ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে

বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয় কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।"

'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা, বাংলা' বানান সম্বন্ধে ২নং নিয়ম আলোচনা-কালে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করেছি। উচ্চারণের খাতিরে 'বাঙালী' (রবীন্দ্রনাথের বানান 'বাঙালি') এবং মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে 'বাঙ্গালী' দুই বানানই আমরা সমর্থন করি। সংস্কৃত 'রঙ্গ' থেকে উৎপন্ন হলেও 'বর্ণ' অর্থে অধুনা 'রঙ'-এর উচ্চারণ 'রঙ্গ' বাংলাদেশে কোথাও নেই, অতএব 'রঙ্গ' বানানের প্রশ্নই আসতে পারে না, অর্থাৎ 'রঙ্গের' বানান চলে না। 'রঙ্গ' শব্দে আজকাল আমরা বুঝি 'কৌতুক, মজা, নাট্য' ইত্যাদি, বর্ণ নয়। সংস্কার-সমিতি বলছেন "'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ"—আমরাও বলি এ যুক্তি অসার নয়। 'ই, ঈ' আলোচনায় এ ব্যাপারে সুনীতিকুমারের অভিমত বা প্রবণতার কথাও উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে সংস্কার-সমিতির অন্য একটি মন্তব্যও আমাদের ভাল লেগেছে—"ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান।" ঠিক এই কথাই আমরা 'জ য', 'ণ ন' সম্পর্কে বলেছি এবং এই কারণেই 'য' ও 'ণ'-এর বিরুদ্ধে বানান-বিধাতাদের সর্বাত্মক অভিযান সমর্থন করতে পারি নি।

সংস্কার-সমিতির দশম নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মটিও সুচিন্তিত হয়েছে। "শ ষ স।—মূল সংস্কৃত অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা—'আঁশ<অংশু, আঁষ<আমিষ, মশা<মশক, সরিষা< সর্ষপ'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'মিনসে<মনুষ্য, সাধ<শ্রদ্ধা' ইত্যাদি। দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'করিস, ফরসা, ফরশা, উসখুস, উশখুশ'। বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে, কিন্তু কতকগুলি

শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, অর্থাৎ প্রচলিত বানান বজায় থাকিবে, যথা—'ইস্তাহার, গোমস্তা, ভিস্তি, খ্রীষ্ট'।"

কতকগুলি চলতি শব্দের বানানও দেওয়া হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী দুষ্প্রাপ্য। উৎসাহী পাঠক 'চলন্তিকা' কিংবা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান খুলে দেখতে পারেন।

তবে এই প্রসঙ্গে দু-একটা মন্তব্য না করে পারছি না, যদিও পূর্বে একাধিকবার এই মন্তব্য করা হয়েছে। উচ্চারণ-বিকারের জন্য সমিতি মূর্ধন্য ণ-কে প্রাকৃত বাংলায় স্থান দেন নি। মূল সংস্কৃত শব্দ সামান্য আ-কার ই-কার যোগে অর্ধ-তৎসম শব্দে পরিণত হলেও সমিতি ণ-কে গৃহমধ্যস্থ কৃষ্ণসর্পের মতো সংহার করেছেন কিন্তু মূর্ধন্য ষ-এর বেলা সমিতি নির্মম তো ননই, বরং বেশ যেন প্রশ্রয়দাতা। আমাদের ধারণা 'মূর্ধন্য ণ' তবু উচ্চারণ করা যায়, কিন্তু 'মূর্ধন্য ষ'-ধ্বনি বাঙ্গালী-রসনায় দুঃসাধ্য। অথচ মূর্ধন্য ষ-কে সমিতি অপাঙ্‌ক্তেয় করলেন না। আমরা যুক্তিধারা অনুধাবন করতে পারি নি। যা হোক, মূর্ধন্য ষ-এর প্রতি যে অবিচার হয় নি এজন্য আমরা সমিতিকে অশেষ সাধুবাদ জানাচ্ছি। 'শ ষ স' সম্বন্ধে সমিতি উপযুক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। কেবল 'খ্রীষ্ট' শব্দকে ব্যতিক্রম-পর্যায়ে রাখলেন কেন বুঝি না। হয়তো বলা হবে 'খ্রীষ্ট' বাংলা ভাষায় উচ্চারণ-সিদ্ধ শব্দ। এই যুক্তি মানতে হলে 'ষ্টীমার, ষ্টেশন, মাষ্টার, ক্লাশ, পাশ (pass), পুলিশ, ইশ্‌কুল' প্রভৃতি বানানও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সংস্কার-সমিতি এই শব্দগুলিকে ব্যতিক্রান্ত বলেন নি। বহু লেখক 'ক্লাশ, পাশ, পুলিশ' বানান লেখেন, তাঁরা সংস্কার-সমিতির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেছেন, না পূর্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেন নি জানি না। কেউ কেউ লেখেন 'ইশ্‌কুল'। এই বানান পূর্বে কখনও ছিল না—মনে হচ্ছে এঁরা বানান-সংস্কার করতে চান। পূর্বযুগের উচ্চারণপন্থীরা 'স্কুল' থেকে 'ইস্কুল' পর্যন্ত এসেছিলেন, 'ইশ্‌কুল' পর্যন্ত অগ্রসর হন নি। বানান-সচেতন তৎকালীন যুবক প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু

বৈদেশিক শব্দে বাংলা উচ্চারণ sh হলে শ, s হলে স লিখতেন। বুদ্ধদেব বসু লিখতে শুরু করলেন 'স্‌টেশন, স্‌টীমার (ট-এ দীর্ঘ-ঈ কি হ্রস্ব-ইকার মনে নেই'। তখনও 'স্ট' হরফ নির্মিত হয় নি, বাধ্য হয়ে বুদ্ধদেবকে লিখতে হত 'স্‌টেশন'। বিরুদ্ধবাদীরা বিদ্রূপ করে বলতেন 'স-টেশন'। তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের নীচেই ছিল একটি কাপড়ের দোকান, তার সাইনবোর্ডে নাম ছিল 'ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটি'। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুনীতিকুমার প্রবেশপথে নির্গমপথে প্রতিদিন এই বানান দেখে দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলতেন 'ইষ্টো (ইশ্‌টো) বেঙ্গল সোসাইটি'। বৈদেশিক শব্দে 'ষ্ট' সম্বন্ধে এইজাতীয় বিতৃষ্ণার ফলে নূতন হরফ সৃষ্ট হল 'স্ট'। বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতির ২০ নং নিয়মে আছে "নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে স্ট বিধেয়, যথা—স্টোভ" (চলন্তিকা)। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে পাই "নূতন সংযুক্তবর্ণ স্ট বিধেয়"। মনে হচ্ছে সংস্কার-সমিতির নিয়ম প্রণয়নের পূর্বেই 'স্ট' হরফ নির্মিত হয়েছিল। এইবার কিন্তু সংস্কার-সমিতি অজান্তে পৈশাচী প্রাকৃতে প্রবেশ করলেন। "ষ্টস্য স্টঃ—পৈশাচ্যাং ভাষায়াং ষ্ট ইত্যস্য স্থানে স্ট ইত্যয়মাদেশো ভবতি। কষ্টম্ > কস্টম্।" মূর্ধন্য বর্ণের সহিত দন্ত্য বর্ণ যুক্ত হতে পারে না বলেই সংস্কৃতে 'ষ্ট ষ্ঠ স্ত স্থ ষ্ণ স্ন'-র বিধান রয়েছে। মূর্ধন্য বর্ণের সহিত দন্ত্য বর্ণের সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন ঘটলেই দন্ত্য বর্ণ মূর্ধন্য বর্ণে পরিণত হয়—'অধি + স্থিত = অধিষ্ঠিত, নি + স্নাত = নিষ্ণাত (skilful)'। সংস্কার-সমিতি মূর্ধন্য ণ-কে প্রাকৃত বাংলা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েও যে 'ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ' হরফগুলি স্বীকার করে নিয়েছেন, এটাও কিন্তু তার কারণ হতে পারে। কিন্তু 'ইষ্ট বেঙ্গল' এবং 'স্‌টেশন' এতই দৃষ্টিপীড়া জন্মাচ্ছিল যে দায়িত্বশীল পণ্ডিতবর্গের একরকম অগোচরেই ছাপাখানায় 'স্ট' হরফ এসে গেল। এই হরফটির প্রথম নির্মাতা কে জানি না। যিনিই হোন তাঁকে অসম-সাহসিক বলতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বহুকাল যাবৎ ছাপাখানায়

কতকগুলি দুষ্ট অক্ষরও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে; যথা—ক্ষ্ণ (ক্ষ-র সঙ্গে যুক্ত দন্ত্য-ন), হ্ন (হ-এর নীচে দন্ত্য-ন)। ক্ষ=ক্+ষ; ষ-এর পরে সংস্কৃত বিধানে দন্ত্য ন-এর স্থান নেই, হওয়া উচিত ক্ষ্ণ (ক্ষ-র সঙ্গে যুক্ত মূর্ধন্য-ণ)। হ-এর সঙ্গে দন্ত্য-ন যোগ করলে যে হরফ চলতি আছে তা হচ্ছে হ্ন। হ-এর নীচে থাকে মূর্ধন্য-ণ—হ্ণ। কিন্তু দুষ্ট হরফ হ্ন (অর্থাৎ হ-এর তলায় দন্ত্য-ন) বৈয়াকরণের চোখে ধূলি দিয়ে অন্যত্র তো বটেই, ব্যাকরণ-অভিধান গ্রন্থগুলিতেও নির্বিরোধে স্থান পেয়ে আসছে। আশ্চর্য এই যে শত শত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, স্বনামধন্য মুদ্রাযন্ত্র, সহস্র সহস্র কৃতী লেখক—আজ পর্যন্ত কারও এদিকে নজর পড়ছে না। ভাষার প্রতি আমাদের দরদ নেই একথা নিশ্চয়ই বলব না, কিন্তু এইজাতীয় ত্রুটিকে চোখ বুজে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে যে একটা তাচ্ছিল্যবোধ আছে, একথাও অস্বীকার করা চলে না। অথবা এটা আমাদের জাতিগত শৈথিল্য। এই শৈথিল্যের ফলে ভারতে মুদ্রিত খুব কম গ্রন্থই পাওয়া যাবে যাতে মুদ্রণ-প্রমাদ নেই।

সংস্কার-সমিতির একাদশ নিয়ম—"ক্রিয়াপদ: সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্তরূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়। চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে ঊর্ধ্বকমা বর্জন করা যাইতে পারে এবং -লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।"

অতঃপর 'বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ' দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে শুধু হ-ধাতু ও কর্-ধাতুর উদাহরণ তুলে দিচ্ছি:

হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল, হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল। করেছিল।

ক'রব (ক'রবো), ক'রবে। ক'রো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

সংস্কারের পূর্বে ক্রিয়াপদের বানানে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল দুঃসহ। সংস্কারের পর মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা এসেছে বটে, কিন্তু ঈপ্সিত স্থিরতা আসে নি। তার এক কারণ বিকল্প-বিধান, অন্য কারণ আধুনিক লেখকদের ও-কারের প্রতি অত্যাসক্তি। ফলে কেবল "হ্‌ল, হ'ল" নয়, "হোল, হলো, হোলো" সবই চলছে। এমন কি 'ছিল'-ও 'ছিলো' হয়ে গেছে। 'ছিল' বানানেও অ-কারান্ত উচ্চারণ কেউ করে না, তথাপি ও-কার বসালে ভাষাপণ্ডিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কৌতুকই মনে পড়ে—Painting a Negro black। তা ছাড়া '-লুম, -লেম' এই সম্পূর্ণ আঞ্চলিক কথ্য বিভক্তি চলিত ভাষায় বিহিত করে ক্রিয়াপদের বানানের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। 'এ জলতরঙ্গ' রোধ করবার শক্তি কারও আছে কিনা জানি না—যদি না থাকে, বৃথাই বানানে শৃঙ্খলাবিধানের চেষ্টা।

সংস্কার-সমিতি প্রথম সংস্করণে যে-বিধান দিয়েছিলেন সেই বিধানে দৃঢ় থাকতে পারলে ক্রিয়াপদের বানানে শৃঙ্খলা আসতে পারত। প্রথম সংস্করণে সমিতি বলেছিলেন :

> "চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বানানে অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা (ইলেক) বা হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক, কিন্তু ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য কয়েকটি রূপে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে ; যথা—হস (হ'স), হল (হ'ল), হলে (হ'লে), হত (হ'ত), হতে (হ'তে) ; কিন্তু হোক, হোন।"

অর্থাৎ সাধারণ বানান—"হস, হল, হলে, হত, হতে", কিন্তু অর্থবোধে বাধা জন্মালে "হ'স, হ'ল, হ'লে, হ'ত, হ'তে"। "হোক, হোন" প্রথম সংস্করণে স্বীকৃত বানান, এ ছাড়া ও-কার অন্য কোথাও বিহিত হয় নি। প্রথম সংস্করণে -লাম বিভক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল "সাধু ক্রিয়াপদের -লাম বিভক্তি স্থানে চলিত ক্রিয়াপদেও -লাম বিধেয়,

কারণ ইহা বহু অঞ্চলের মৌখিক রূপে প্রচলিত এবং সাধু রূপেরও অনুযায়ী।" প্রথম সংস্করণের এই বিধান শেষ সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে রবীন্দ্র-প্রয়োগের প্রতিকূল বলেই সমিতি এই সংস্কার বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেন নি। কিন্তু আধুনিক লেখকেরা যে-পরিমাণ ও-কার বর্ষণ করে চলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কখনও এত অজস্র ও-কার চালান নি। আমাদের মতে অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষ ছাড়া আর কোথাও ও-কার অত্যাবশ্যক নয়।

সংস্কার-সমিতির দ্বাদশ নিয়ম—

"কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ—'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরানো, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধু শব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধু রূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।"

মূলতঃ এই নিয়মটির উপরে নির্ভর করবে চলিত ভাষার প্রকৃতি। পুরাপুরি কথ্য ভাষা যে চলিত ভাষার উপযোগী নয়, সংস্কার-সমিতি এই নিয়ম প্রণয়ন করে তা স্বীকার করে নিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, আদ্য অক্ষরের মৌখিক বিকৃতি চলিত ভাষায় গ্রহণীয় নয়। তার অর্থ—সবরকম কথ্য শব্দই চলিত ভাষায় প্রবেশ লাভ করতে পারে না। কিন্তু সমিতি আদ্য অক্ষরের মৌখিক বিকৃতি লৈখিক ভাষায় সমর্থন করছেন না, অথচ মধ্য অক্ষর বা শেষ অক্ষরের বিকৃতি গ্রহণীয় মনে করছেন, এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারছি না। আমাদের ধারণা, মৌখিক বিকৃতির কোন অংশ যদি সাহিত্যিক ভাষায় স্বীকৃতি পায়, তা হলে সর্ববিধ মৌখিক বিকৃতিই সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পাবে। খুব কম লেখকই এই নিয়মটির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

তাঁরা যেমন মধ্য বা শেষ অক্ষরে বিকৃতির 'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন' লিখছেন, তেমনি আদ্য অক্ষরের বিকৃতিকেও অপাঙ্‌ক্তেয় মনে না করে 'পেছন, পেতল, ভেতর, ওপর' নিরুদ্বেগে লিখে চলেছেন। এই সূত্রে তৎসম শব্দের বিকৃতিও প্রাকৃত বাংলাকে ছেয়ে ফেলেছে। আমাদের বিবেচনায়, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্য কোন পদের সামান্য মৌখিক বিকৃতিকেও চলিত ভাষায় প্রশ্রয় দিলে বানানে সামঞ্জস্য-বিধান অসম্ভব হবে। যাঁরা বানান-সংস্কারে অগ্রণী হয়েছেন বা হবেন তাঁরা এই বিষয়ে সম্যক্ অবহিত না হলে কদাপি ঈপ্সিত বানান-সাম্য দেখা যাবে না। রাজশেখর বসুর উক্তি উদ্ধৃত করেই আমরা পূর্বে বলেছি, আবারও বলি যে চলিত ভাষা ও কথ্য ভাষা এক নয়। অবশ্য একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে বিশেষ্য-বিশেষণ-নির্বিশেষে কথ্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ চলিত ভাষায় এসে যাবেই। কিন্তু অতৎসম শব্দেরও মৌখিক বিকৃতি যদি 'নিয়মের মধ্যে' আমল না পায়, তাহলে অন্ততঃ তৎসম শব্দগুলি সাহিত্যিক ভাষায় বানান-বিকৃতি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

সংস্কার-সমিতির পরবর্তী নিয়মগুলি ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে। তৎপূর্বে আমরা আধুনিক বানানের বিশেষ বিশেষ দিকে ঝোঁক সম্বন্ধে দু'এক কথা বলতে চাই।

বিসর্গ :

সমিতি বিসর্গ-ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম প্রণয়ন করেন নি, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এ বিষয়ে বিধি ছিল—"বাংলা বিসর্গান্ত সংস্কৃত শব্দের শেষের বিসর্গ বর্জিত হইবে ; যথা—আয়ু, মন, ইতস্তত, ক্রমশ, বিশেষত ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মধ্যে বিসর্গ-সন্ধি যথানিয়মে হইবে ; যথা—আয়ুষ্কাল, পুনঃপুন, সদ্যোজাত ইত্যাদি।"

সমিতি দুই সংস্করণ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তৃতীয় সংস্করণে পিছিয়ে

গেলেন কেন বুঝতে পারি না। বিসর্গ-বর্জনে কি পণ্ডিত মহাশয়দের আপত্তি ছিল? হতে পারে, তাঁদের মৃদু আপত্তি প্রথম দুই সংস্করণ পর্যন্ত সংস্কারকদের টলাতে পারে নি, কিন্তু তৃতীয় সংস্করণ-কালে পণ্ডিত মহাশয়েরা বোধ হয় আবার আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে থাকবেন। তাই ও-সংস্কারটা আর হয়ে উঠল না—লেখকদের মর্জির উপরই ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বহুকাল আগে থেকেই বিসর্গের উপর বিরক্ত। তাঁর রচনায় শব্দান্তে বিসর্গের বিন্দুবিসর্গও দেখা যাবে না। ভুল বললাম—বিন্দু যথেষ্ট দেখা যাবে, বিসর্গ একেবারে দেখা যাবে না। অতএব আধুনিক লেখকেরাও তাঁদের লেখায় শব্দান্তে বিসর্গকে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। ফল খুব শুভ হয় নি। খবরের কাগজ খুললেই দেখা যাবে 'নভোচর, যশেচ্ছা, তেজেন্দ্র' প্রভৃতি দুষ্ট সন্ধি। 'নভোচর' যাঁরা লেখেন, 'নভস্' শব্দ কিংবা বিসর্গ-সন্ধি সম্বন্ধে হয়তো তাঁদের জ্ঞানই নেই। যাঁরা 'যশেচ্ছা, তেজেন্দ্র' লেখেন তাঁদেরই বা দোষ কী? যেসমস্ত শব্দের উচ্চারণ 'যশ্, তেজ্' সেসমস্ত শব্দ বড়-জোর অ-কারান্ত 'যশ, তেজ' হতে পারে, তাদের অন্তে যে আরও একটা বিসর্গ থাকতে পারে এ ভাবনা প্রায়শঃ আসে না। বিশেষ্য পদকে এ দুর্গতি থেকে রক্ষা করার উপায় নেই। কারণ বিশেষ্য পদকে বিভক্তি গ্রহণ করতেই হবে এবং বিভক্তি আগমে বিসর্গান্ত বিশেষ্যের বিসর্গ আপনা থেকেই খসে পড়বে। 'এ, এর' প্রভৃতি লাগাতে হলে পদান্তে বিসর্গের আর স্থান হয় না। কিন্তু সংস্কৃত ঋ-ভাগান্ত শব্দের সম্বোধনে (মাতঃ, পিতঃ, ভ্রাতঃ) কিংবা তসিল্ বা চশস্ প্রত্যয়-যুক্ত অব্যয়-পদের এ অবস্থা নয়। অদ্যাবধি 'মাতঃ, পিতঃ, ভ্রাতঃ' প্রভৃতি শব্দে উচ্চারণ-বিকৃতি ততটা ঘটে নি। 'অন্ততঃ, সাধারণতঃ, বিশেষতঃ, ক্রমশঃ, প্রায়শঃ, বহুশঃ' প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ-ধ্বনি লুপ্ত হলেও শব্দগুলি এখনও অ-কারান্ত আছে। বিসর্গটিকে বিসর্জন করলে অন্তের অ-ধ্বনিও উবে যাবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতির দ্বিতীয় সংস্করণ পুস্তিকা প্রকাশের পর

চন্দননগর সাহিত্য-সম্মেলনে এক বক্তৃতায় অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ রসাল ভাষায় বলেছেন :

"কিন্তু একটা কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। বাঙ্গালা অ-কারান্ত অযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ যে হসন্ত হইয়া দাঁড়ায় সেটা কি তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন? এই হসন্তের ঝোঁকের ফলে দুদিন বাদেই যে 'ক্রমশ' লোমশ মুনি হইয়া উঠিবে; 'বস্তুত' প্রস্তুত হইয়া যাইবে; 'পিত' ঠাণ্ডা শীত হইয়া যাইবে। বিসর্গটির অস্তিত্ব অন্ততঃ এই দুর্ব্বিপাকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে কথঞ্চিৎ সহায়তা করে। আর একটি মজার কাণ্ড উঁহারা করিয়াছেন, 'পুনঃপুনঃ'-কে করিয়াছেন 'পুনঃপুন'; আমি বুঝিতেছি না যে মাঝের বিসর্গটির উপর উঁহাদের হঠাৎ এতটা মমতা উপজিল কি কারণে; ওটিকেও বিদায় দিয়া সোজাসুজি 'পুনপুন' করিলেই ত বঙ্গভাষার গঙ্গাযাত্রার পথ সুগম হইত।"

বাস্তবিক্ পক্ষে আমরা তো মনে করি 'পুনঃপুন, ইতস্তত' প্রভৃতি বানান-বিধানই প্রমাণ করে যে এসব শব্দে বিসর্গ অপ্রয়োজনীয় তো নয়ই, অপরিহার্য। সুনীতিকুমার 'অন্ততঃ, সম্ভবতঃ, সাধারণতঃ, বশতঃ' না লিখে 'অন্ততো, সম্ভবতো, সাধারণতো, বশতো' লিখছেন, 'পুনঃপুনঃ'কে 'পুনঃপুনো' লিখতে এখন পর্যন্ত দেখি নি। 'মাতঃ, ভ্রাতঃ' -কে তিনি কী করতে চান?

বর্গ্য ব, অন্তঃস্থ ব :

'জ-য, ণ-ন, শ-ষ-স' একই উচ্চারণে এই একাধিক বর্ণসমূহ বাংলা ভাষায় অনাবশ্যক বলে অনেকে মতপ্রকাশ করেছেন এবং এঁরা প্রস্তাব করেছেন 'জ, ন, শ' ছাড়া অন্য বর্ণগুলিকে ভাষা থেকে বিতাড়ন করা হোক। বহুকাল যাবৎ বহু ভাষা-পণ্ডিতের বিরোধিতাসত্ত্বেও উক্ত বর্ণগুলি এখন পর্যন্ত ভাষায় টিকে আছে এবং আরও কিছুকাল থাকবে বলেই ভরসা করি। সহসা এদের বিলোপ ঘটবে না। কিন্তু বর্গ্য-ব

ও অন্তঃস্থ-ব'এর প্রশ্ন আলাদা। অন্তঃস্থ-ব ভাষায় থেকেও নেই। সন্ধির একটা সূত্র ছাড়া বাংলা ভাষায় অন্তঃস্থ-ব'এর অস্তিত্বই আমরা ভুলে গেছি। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গ্য বর্ণ পরে থাকলে পদান্তের ম্ অনুস্বার বা পরবর্তী বর্ণ যে-বর্গের সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—সম্+বোধন =সংবোধন বা সম্বোধন, কিন্তু অন্তঃস্থ-বর্ণ পরে থাকলে শুধু অনুস্বার হয়, যথা—কিম্+বা=কিংবা (কিম্বা হবে না), প্রিয়ম্+বদা=প্রিয়ংবদা (প্রিয়ম্বদা হবে না)। 'কিম্বা, কিম্বদন্তী, এবম্বিধ, প্রিয়ম্বদা, বশম্বদ, বারম্বার, সম্বৎসর, সম্বরণ, সম্বর্ধনা, সম্বাদ, স্বয়ম্বর' প্রভৃতি শব্দ অশুদ্ধ, কারণ এইসমস্ত শব্দের ব অন্তঃস্থ ; শব্দগুলির শুদ্ধ বানান 'কিংবা, কিংবদন্তী, এবংবিধ, প্রিয়ংবদা, বংশবদ, বারংবার, সংবৎসর, সংবরণ, সংবর্ধনা, সংবাদ, স্বয়ংবর'। বর্গ্য-ব ও অন্তঃস্থ-ব চেনার উপায়ও আছে—

উদ্‌দৃঠৌ যত্র বিদ্যেতে যো বঃ প্রত্যয়-সন্ধিজঃ।
অন্তঃস্থং তং বিজানীয়াৎ তদন্যো বর্গ্য উচ্যতে॥

কিন্তু বাংলা ভাষায় এই পরিচয়ের বিশেষ কোন মূল্য নেই। কারণ একমাত্র উক্ত সন্ধিটি ছাড়া বাংলায় বর্গ্য-ব ও অন্তঃস্থ-ব'এ কোন পার্থক্য করা হয় না। এমনকি অভিধানেও কেবল ব-ফলা নির্দেশ করতেই অন্তঃস্থ-ব ল-বর্ণের পরে স্থান পেয়েছে, অন্যত্র বর্গ্য-ব'এর সঙ্গেই মিশে আছে। তথাপি আমরা বর্ণটির উৎখাত কামনা করি না এবং সতর্ক লেখকদের সন্ধিটির প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

ক্ষ :

প্রাকৃত বাংলা থেকে ক্ষ নির্বাসিত হয়ে গেছে। পূর্বাচার্যদের বানানে অকারণেও ক্ষ এসে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করেছিল (সেক্ষপীয়র, মোক্ষমুলর), শাস্তিস্বরূপ পরবর্তী যুগে ক্ষ একেবারে বিতাড়িত। ক্ষিপ্ত>খ্যাপা, ক্ষুদ্র>খুদে, ক্ষুধা>খিদে, ক্ষেত্র>খেত তো আছেই,

এমনকি অভগ্ন তৎসম ক্ষুর, ক্ষেপ, ক্ষোদিত প্রভৃতি শব্দও প্রাকৃত বাংলায় খুর, খেপ, খোদিত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগে খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলিতেও ক্ষ ঠাঁই পাচ্ছে না, এতেই বোঝা যায় ক্ষ কতটা অবাঞ্ছিত বর্ণ। প্রাচীন বর্ণমালায় ক্ষ ছিল চতুস্ত্রিংশ বর্ণ। সংযুক্ত বর্ণ হওয়ার অপরাধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষ-কে 'বর্ণমালা' থেকে বহিষ্কৃত করেছেন, উচ্চারণ-বিকৃতির অপরাধে ক্ষ এযুগে তৎসম শব্দেও অস্পৃশ্য হয়ে গেছে। বেচারা ক্ষ ! এর পুনর্বাসন সম্ভব কিনা পণ্ডিতগণ একবার চিন্তা করে দেখতে পারেন।

ঞ :

বাংলা বর্ণমালায় একটি বর্ণ আছে, একে নিয়ে কারও কোন সমস্যা নেই। অত্যন্ত নিরীহ বর্ণ। কাউকে বানান-ভুলের দোষে হাস্যাস্পদ করে তোলে না। কিন্তু অদ্ভুত এর চেহারা। তদধিক অদ্ভুত বর্ণটির উচ্চারণ। পূর্ববাংলায় উচ্চারণ 'নিয়ো'। সেকালে শিশুদের অক্ষর-পরিচয় করানো হত 'পিঠে বোঁচকা নিয়ো'। পশ্চিমবাংলায় উচ্চারণ 'য়ঁ' ('ইঁঅঁ')। 'চ ছ জ ঝ'-এর ঠিক পরেই অবস্থিত 'ঞ' বর্ণটির একক খাঁটি উচ্চারণ আজ কোথাও নেই। মেদবহুল এই বর্ণটি একা চলাফেরা করতে পারে না। এর বাহন চ ছ জ ঝ। একে যখনই দেখা যায়, হয় 'চ ছ জ ঝ'-এর মাথায় চেপে বসে রয়েছে, নয় তো চ আর জ'এর কাঁখ আঁকড়ে আছে—ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, চ্ঞ, জ্ঞ। তবে হাতের লেখায় এই অক্ষরগুলি কাউকে কাউকে বিপন্ন করে—বিশেষ ভাবে ঞ্জ আর জ্ঞ। অসতর্ক লেখক জ্ঞ লিখতে গিয়ে ঞ্জ লিখে বসেন। আজ অবশ্য ঞ'র এই খঞ্জ দশা। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় ঞ'র ছিল প্রবল প্রতাপ।

ন স্থানে ঞ : ঞিঅম (নিয়ম), ঞিস্তারিতে (নিস্তারিতে), ঞিশ্চিন্ত (নিশ্চিন্ত), ঞির্বিঘ্নে (নির্বিঘ্নে)।

ম স্থানে ঞ : তুঞি (তুমি), গোসাঞি (গোস্বামী)।

চন্দ্রবিন্দু স্থানে ঞ : ঞিহার (ইঁহার), ঞেহারে (এঁহারে)।

অনুনাসিকের পরে ঞ : নাঞি (নাহি), নাঞিক (নাহিক), শুনিঞা (শুনিয়া), আনিঞা (আনিয়া), প্রণমিঞা (প্রণমিয়া), অমিঞা (অমিয়া), জন্মিঞা (জন্মিয়া)।

অনুনাসিকের পূর্বে ঞ : কঞোন (কওন>কোন), মন্দাঞিনি (মন্দাকিনী)।

সানুনাসিক উচ্চারণ-হেতু ঞ : ধাঞা (ধাইয়াঁ), লঞা (লইয়াঁ), দিঞা (দিয়াঁ), গিঞা (গিয়াঁ), যাচিঞা (যাচিয়াঁ), শিখাঞা (শিখাইয়াঁ)।

অতঃপর নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দের বানান। এ বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রধানতঃ তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দের বহুপ্রকার বানান আমাদের নেত্রপীড়া জন্মায়। বিদেশী শব্দ যেগুলি বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে তাদেরও বানান-সাম্য আবশ্যক। কিন্তু নবাগত সবরকম বিদেশী শব্দের জন্য কড়াকড় নিয়ম-প্রণয়নের খুব একটা প্রয়োজন দেখি না। বিদগ্ধ লেখকদের হাতে নবাগত বিদেশী শব্দের বানান (অর্থাৎ যেসব শব্দ ভাষার অঙ্গীভূত হয় নি তাদের বানান) ছেড়ে দিলে খুব একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে বলে বোধ হয় না। সব শব্দের স্থিতাবস্থাও এখন পর্যন্ত আসে নি। তা ছাড়া ইংরেজী ভাষায় বহু শব্দেরই ধ্বনি অনির্দিষ্ট (vague sound)। ইংরেজী College শব্দটি সর্বজন-পরিচিত। প্রথম অংশ 'Coll'-এর উচ্চারণ কী? অনির্দিষ্ট ধ্বনি। ফলে সেযুগের লেখকেরা লিখতেন 'কালেজ', এযুগে লেখা হয় 'কলেজ'। কিন্তু 'ege'-এর ধ্বনি স্পষ্ট 'ইজ্'। লেখা উচিত 'কলিজ'। আজ যদি বাংলায় 'কলিজ' লেখা হয়, সকলের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে। 'Cholera' শব্দ আমাদের মুখে 'কলেরা'। ইংরেজী উচ্চারণ 'কলারা'। অবশ্য 'ক' এবং 'লা' দুয়েরই ধ্বনি অনির্দিষ্ট, তবে কখনই 'লে' নয়। 'Copy'-কে আজকাল অনেকেই লেখেন 'কপি'।

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবন পর্যন্ত লিখে গেছেন 'কাপি'। ইংরেজী শব্দের বিশুদ্ধ প্রতিবর্ণীকরণ বাংলা ভাষায় সম্ভব নয়। গ্রীক 'সোক্রাতেস্' শব্দ ইংরেজী ভাষায় 'সক্রেটিজ্' (tēz)—বাংলা ভাষায় কী বানান হবে? হিব্রু Yehoshua, পর্তুগীজ Jesu, ইংরেজী Jesus (zus) বাংলায় কী হবে? আরবী ফার্সী শব্দ বাংলায় উচ্চারণও সম্ভব নয়, লিপ্যন্তরও সম্ভব নয়। এসব পণ্ডশ্রম। অত দূরেই বা যাই কেন? মহারাষ্ট্রীয় 'টিলক' আমাদের মুখে 'তিলক' হয়েছেন। আবার 'গুজরাত' আমাদের মুখে 'গুজরাট'। কারণ কী? ভাষাতাত্ত্বিকেরা এ বিষয়ে গবেষণা করুন। আমাদের বক্তব্য—বিদেশী ভাষার উচ্চারণ বাংলা ভাষায় পুরাপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই চীনা পরিব্রাজকের নাম উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবিন্যাস-চেষ্টায় যা দাঁড়িয়েছে, তা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান থেকে তুলে দিচ্ছি—

হাইয়েন সাঙ্, হিউএন সিয়াং, হিউয়েন সাঙ্, হিউএন্‌থ্ সাঙ্, হিয়োন সঙ, হুয়েনথ্ সাং, হুএন সাং, হুয়ান চুয়াঙ্গ, হোএন সাং, হোএন্-থ সাঙ্, ইয়াং চিয়াং, হুয়েন্থ সাঙ্, হিউন সাঙ্, হিউ এন্ সাঙ, হ্‌িউএন্থ সং, হিয়াং সিয়াং, উ এন চাংগ, যুআন্ চোআঙ্ বা চুআঙ্।

সংস্কার-সমিতির ত্রয়োদশ নিয়ম—

"বিবৃত অ (cut-এর u): মূল শব্দে বিবৃত অ থাকিলে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা —ক্লাব (club), বাস (bus), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), সার্কস (circus), ফোকস (focus), রেডিয়ম (radium), হিরোডোটস (Herodotus)।"

'ক্লাব, বাস' বানানে আমাদের আপত্তি নেই। 'সার্' বোধ হয় ঠিক উচ্চারণমাফিক নয়। ধ্বনিগত বানান দেওয়ার চেষ্টায় কেউ লেখেন 'স্যর', কেউ লেখেন 'স্যার'। 'Third' শব্দের ধ্বনিগত বানান বাংলায় কিছুতেই সম্ভব নয়, সুতরাং 'থার্ড' বানানে আমাদের আপত্তি

নেই। 'Budget' শব্দের ইংরেজী উচ্চারণ 'বাজিট'; 'বাজেট' লিখব কেন? একমাত্র উত্তর আমাদের মুখে উচ্চারণ বিকৃত হয়েছে; যেমন উচ্চারণ করছি, তেমনই লিখছি। 'সার্কস, ফোকস, রেডিয়ম, হিরোডোটস' লিখব কেন? বাংলায় আ-কার সব সময়ে দীর্ঘ নয়, আবার অ-কারও সব সময়ে হ্রস্ব নয়। আমরা 'সার্কাস, ফোকাস, হিরোডোটাস' বানানের পক্ষপাতী—এই ভাবেই শব্দগুলিকে উচ্চারণ করি। 'Shakespeare'-কে অনেকেই লেখেন 'শেক্স্পীয়র; আমাদের বানান 'শেক্স্পিয়ার'—প-ও দীর্ঘ নয়, য়-ও হ্রস্ব নয়।

চতুর্দশ নিয়ম—"বক্র আ (বা বিকৃত এ, cat -এর a): মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড, হ্যাট।"

এতক্ষণে একটা কথা বলি। এই 'বিকৃত এ' ধ্বনিটি সংস্কৃত ভাষায় নেই, অতএব এই ধ্বনি-প্রকাশক কোন বর্ণও সংস্কৃত বর্ণমালায় নেই। ফলে বাংলা ভাষায়ও এই ধ্বনির প্রতীক কোন বর্ণ নেই, যদিও বাংলা ভাষায় ধ্বনিটি আছে। বাংলা ভাষায় শুদ্ধ স্বরধ্বনি সাতটি—অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। 'বিকৃত এ'-ধ্বনি পূর্বে 'এ' বর্ণদ্বারাই প্রকাশ করা হত, পরবর্তী কালে একটি নূতন অক্ষর সৃষ্ট হল 'অ্যা', কেউ কেউ লিখলেন 'এ্যা'। দুটিই বিদ্‌ঘুটে অক্ষর—স্বরবর্ণের সঙ্গে য-ফলা আ-কার যোগ। অনেকে এই অদ্ভুত অক্ষর স্বীকার করে নিতে পারলেন না। তাঁরা এই 'বিকৃত ধ্বনি' বোঝাতেও পূর্ববৎ 'এ' বর্ণই ব্যবহার করে যেতে লাগলেন, যেমন: Account—একাউন্ট, Acid—এসিড, এডমিরাল, এডভোকেট, এফিডেভিট, এগ্রিকালচার, এলাউ, এলার্ম, এণ্ড (and), এটর্নি, এরোরুট, এমেচার, এথেন্স। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যোজ্য রূপেও 'এ'-কারই (ে) থাকল। সুতরাং লেখা হতে লাগল 'বেঙ (ব্যাঙ),

ঠেং (ঠ্যাং), ঢেঙ্গা, ঢেপসা, টেংরা, ঠেঁটা, ঠেকার, ঠেঙা, চেপটা, ছেঁচড়'। 'বিকৃত এ'-ধ্বনির জন্য নূতন অক্ষর অ্যা বা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যোজ্য রূপ ্যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'এ' বা 'ে'-কার দিয়েই কাজ চালানোর ফলে 'অ্যা'র উচ্চারণও 'এ' হয়ে গেল। অদ্যাপি অনেকে 'অ্যাসিড, অ্যাফিডেভিট, অ্যাগ্রিকালচার, অ্যাণ্ড, অ্যাথেন্স'-কে উচ্চারণ করেন সংস্কৃত 'এ' ধ্বনি দিয়ে 'এসিড, এফিডেভিট, এগ্রিকালচার, এণ্ড (কোম্পানি), এথেন্স'। Tax শব্দ তো এখনও অভিজাত সম্প্রদায়েরই মুখে 'টেক্সো (টেক্‌শো)'। Gazette-এর Ga-কে 'গ্যা' উচ্চারণ করেন ক'জন শিক্ষিত বাঙ্গালী? Carey সাহেব শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মুখেই 'কেরি', এমনকি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ -প্রকাশিত 'ভারতকোষ' গ্রন্থেও 'ক্যারি' বানান দেওয়া হয় নি, সেখানেও বিশুদ্ধ এ-কারে 'কেরি' বানান করা হয়েছে। বাংলা বানানে অন্য সংস্কারের প্রয়োজন থাকুক, না থাকুক, 'বিকৃত এ'-ধ্বনির জন্য একটি নূতন বর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে তার যোজ্য রূপ একটি নূতন চিহ্ন অত্যাবশ্যক। 'বেচা, খেলা, দেখা' প্রভৃতি এক শ্রেণীর শব্দে 'বিকৃত এ'-ধ্বনি বোঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ে-চিহ্ন চালাতে চেয়েছিলেন। বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগ অদ্যাপি এই নির্দেশ পালন করে আসছেন। কিন্তু এতে সমস্যার কোন সমাধান হয় নি, কারণ একে তো ে-চিহ্ন ে-চিহ্নের পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে এই পার্থক্য সকলের নজরে আসে না। তদুপরি এই চিহ্নে সকল কাজ সিদ্ধও হয় না। রবীন্দ্রনাথও বিদেশী শব্দে লিখতেন 'ম্যালেরিয়া, গ্যাস, ম্যাপ'। তা ছাড়া আদ্যাক্ষরেই ে-চিহ্ন দ্বারা 'বিকৃত এ'-র ধ্বনি বোঝানো যায়, মধ্য বা শেষ অক্ষরে তা সম্ভব নয়। রাজশেখর বসু 'বিকৃত এ'-ধ্বনি বোঝাবার জন্য একটি নূতন স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে তার যোজ্য চিহ্ন উদ্ভাবন করেছিলেন—চিহ্ন দুটি বর্তমান 'এ' এবং 'ে' চিহ্নেরই রকমফের। এ=অ্যা, ে=্যা। একাউন্ট* (Account), মেপ (map)।

---

*এ-চিহ্নটি ঠিক মাপমতো হয় নি, টাইপটি একটু বড় হয়ে গেছে।—গ্রন্থকার

রবীন্দ্রনাথও এই দুই চিহ্ন পছন্দ করেছিলেন। আমাদের মনে হয় বানান-সংস্কার-সমিতিতে এই প্রস্তাব দেওয়া হয় নি, কিংবা দেওয়া হয়ে থাকলেও প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। অথচ এইটিই ছিল প্রকৃত সংস্কার।

বর্তমানে অ্যা ও ্যা-চিহ্ন দ্বারা কাজ চালানো হচ্ছে। কিন্তু অ্যা বর্ণের স্থান বর্ণমালায় অ-এর পরে, আ-এর পরে, না এ-র পরে? সুনীতিকুমারের ব্যাকরণে আছে এ-র পরে। ভারতকোষে অ্যা বসানো হয়েছে আ-এর পরে। চলন্তিকা ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে অ্যা আছে অ-এর পরে। কিন্তু চলন্তিকার ভূমিকায় রাজশেখর বাবু মন্তব্য করেছেন :

"অ্যা একটি স্বতন্ত্র স্বর, বর্ণমালায় তাহার স্থান ঐ-এর পরে হওয়া উচিত। তথাপি খুঁজিতে সুবিধা হইবে বলিয়া অ-এর শেষে দেওয়া হইয়াছে, যথা—'অহোরাত্র'-এর পরে 'অ্যাঁ'। এই বর্ণের যোজ্য রূপ ্যা য-ফলা + আ-কারের সহিত অভিন্ন গণ্য করা হইয়াছে, যথা—'ব্যাঘ্র'-এর পর 'ব্যাঙ'।" হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং অন্যান্য অভিধানকারও ্যা-চিহ্ন দিয়েছেন য-ফলা আ-কারের মধ্যে।

এইটি আর এক বিভ্রান্তি। য-ফলা আ-কার এবং 'বিকৃত এ'-র ব্যঞ্জনে যোজ্য রূপ ্যা একসঙ্গে থাকায় কোন্‌টা কী বোঝা যায় না। ফলে 'ম্যাপ' বানানে বলা হয় 'ম-এ য-ফলা আ-কার'। এমনকি রবীন্দ্রনাথও এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন হয়তো অসতর্কতার দরুন। 'সহজ পাঠ'-এ 'য-ফলা আ-কার'-এর উদাহরণের মধ্যে তিনি 'ব্যাবসা' শব্দও বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'ব্যাবসা' তৎসম শব্দ নয়। তৎসম শব্দ 'ব্যবসায়'। প্রাকৃত বাংলা 'ব্যাবসা' শব্দের বানান ব-এ য-ফলা আ-কার নয়, ব-এ 'বিকৃত এ'-কার।

আমরা আবার বলি, কালবিলম্ব না করে 'বিকৃত এ'-ধ্বনির জন্য নূতন বর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে তার যোজ্য রূপ উদ্ভাবন করা আবশ্যক। বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র রায়ও এই মত পোষণ করতেন। আমাদের

আশঙ্কা ্যা-চিহ্ন যে সর্বত্র য-ফলা আ-কার নয়, এ-বিষয়ে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও অবহিত নন।

সংস্কার-সমিতির পঞ্চদশ নিয়ম—বিদেশী শব্দের ঈ উ উচ্চারণ। এ বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই হয়ে গেছে।

ষোড়শ নিয়ম—"F V স্থানে ফ ভ বিধেয়, যথা—ফুট (foot), ভোট (vote)। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f-তুল্য হয়, তবে বাংলায় ফ হইবে, যথা—ফন (von)।"

F স্থানে ফ হওয়াই উচিত, কেননা F-এর বৈদেশিক উচ্চারণ অল্প-বিস্তর বাংলায় এসে থাকলেও ফ-বানানে অদ্যাবধি কোন গোলযোগ দেখা দেয় নি। ফ-এ ফুটকি দিয়ে বানান করলে অনর্থক এক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হবে। তবে V সম্পর্কে চিন্তা করার আছে। সর্বত্র ভ চলবে কিনা সন্দেহ।

পূর্বযুগে V স্থলে ব দিয়ে কাজ চালানো হত। বাইবেলে Eve-কে লেখা হত 'হবা'। Victoria-কে লেখা হত বিক্টোরিয়া। এমনকি রবীন্দ্রনাথও কোন দিন 'গভর্ণমেণ্ট' লিখতেন না, লিখতেন 'গবর্মেণ্ট'। November-কে লিখতেন 'নবেম্বর'। 'Virgil' রবীন্দ্রলেখনীতে ছিল 'বর্জিল'।

এই প্রসঙ্গে W-র উচ্চারণও তুলি। সে-যুগে Weber, William, Wordsworth-এর বানান ছিল বেবর, বিলিয়ম, বার্দস্বার্থ। বুদ্ধদেব বসু Wordsworth-কে লিখতেন হ্বাড্‌ স্‌হ্বার্থ। রবীন্দ্ররচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের বানান দেখছি ওয়ার্ডস্বার্থ। V-এর বানান অদ্যাবধি কেউ কেউ ব দিয়ে চালান, তবে অনেকেই ভ ব্যবহার করছেন। আমাদের মনে হয় V-এর জন্য ভ-এর তলায় সরু রেখা টেনে একটা নূতন হরফ করলে মন্দ হয় না। কেননা, বিশুদ্ধ ভ-এ অনেকে অস্বস্তি বোধ করেন। পক্ষান্তরে, বাংলা থেকে ইংরেজী লিপ্যন্তরে 'শোভা, বিভা, আভা'-কে যখন 'Sova, Biva, Ava' লেখা হয় তখন খুবই

খারাপ লাগে। সংস্কৃত ফ ও ভ-কে ইংরেজীতে Ph ও Bh দিয়ে লেখা উচিত। প্রফুল্ল = Praphulla (Prafulla নয়), অমিতাভ = Amitabha (Amitava নয়)। তবে বৈদেশিক ফ-এ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই F।

সমিতির সপ্তদশ নিয়ম—"W স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—ডারউইন (Darwin), উড (Wood), ওয়ে (Way)।"

আমাদের মতে এ বানান ঠিক আছে। হিন্দীর অনুকরণে Railway-কে 'রেলবে', কিংবা Jawaharlal-কে 'জবাহরলাল' আমরা পছন্দ করি না। কারণ বাংলা ভাষায় অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ 'উঅ' বা 'ওঅ' নয়। V-প্রসঙ্গেই W-র পূর্বযুগের বানানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অষ্টাদশ নিয়ম—

"য়।—নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার-বণ্ড্' না লিখিয়া 'এডওআর্ড, ওঅর-বণ্ড্' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' বানানে দোষ নাই।"

এই নিয়মে সংস্কার-সমিতি phonetics-এর দৌরাত্ম্য দেখিয়েছেন বটে। যা-কিছু পুরাতন সব বিসর্জন দিতে হবে। নইলে ধ্বনিবিজ্ঞান রসাতলে যায়। মনে আছে 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'খাওয়া, যাওয়া'-কে কিছুকাল 'খাওা, যাওা' লিখতেন। সে-বানান 'প্রবাসী' ছাড়া অন্য কোথাও দেখি নি। ঐ বানান চলল না। সংস্কার-সমিতি অবশ্য বিদেশী শব্দের কথা বলেছেন, তা-ও নবাগত। কিন্তু কোন্‌টা নবাগত, কোন্‌টা পুরাতন, আমরা যে হদিস পাই না। 'জানুয়ারি,

ফেব্রুয়ারি' নবাগত? অনেকেই লিখছেন 'জানুআরি, ফেব্রুআরি'। 'আনা, আনি' বিদেশী প্রত্যয়—'বাবুআনা, হিন্দুআনি' না 'বাবুয়ানা, হিন্দুয়ানি'? 'ওয়ালা' কি বিদেশী প্রত্যয়? 'ওআলা'তে যে অস্থির হয়ে পড়েছি। 'ওআরেন হেস্টিংস, কর্নওআলিস' নবাগত? আমরা তো জানি তাঁরা ক্লাইব (না ক্লাইভ?)-এর পরেই এসে গেছেন। অন্তঃস্থ য, অন্তঃস্থ য় সংস্কার-সমিতির চক্ষুঃশূল। 'খাওয়া, যাওয়া'-কে যদি 'খাওআ, যাওআ' না করা যায়, বিদেশী শব্দেও ও-কারের পর অ আ না থাকলে মারাত্মক অপরাধ হবে না। সংস্কার-সমিতি 'য়' শব্দের পূর্বে 'অনর্থক' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এতেই মনে হয় 'য়'-র প্রতি সমিতির কতটা বিরাগ। "উকার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত"—মোটেই 'অকারণে' নয়, যথেষ্ট 'কারণ' আছে। বহুকাল যাবৎ উ-কার ও-কারের পর য় লেখা হচ্ছে। এর একটা ঐতিহ্য হয়েছে। একে বিদায় দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা বলব 'অকারণে' 'উ এবং ও'-র পরে 'অ আ'-কে টেনে আনা হয়েছে। যেখানে বিশৃঙ্খলা ছিল না সেখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। প্রমাণ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ। তাঁরা একই গ্রন্থে 'জানুআরি জানুয়ারি, ওআলা ওয়ালা' সবই চালাচ্ছেন। ১৯৩৭-এর পূর্বে বানানে অনেক অনাচার ছিল, কিন্তু এই উপদ্রব কোন কালে ছিল না। তার পর 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম'-কে এত করুণা কেন? 'চলিতে পারে' কথার অর্থ কী? মনে হয় 'না চলিলেই' ভাল হয়। Phonetics তাই বলে নাকি? আমাদের তো ধারণা 'মেঅর, চেআর, রেডিঅম' ভুল উচ্চারণ, ভুল বানান। 'ইয়া' না লিখে অনেকে লিখতে শুরু করেছেন 'ইআ'। আমরা মনে করি এই বানান ধ্বনির দিকে নজর রেখে করা হচ্ছে না, কেবল 'নোতুন কিছু করো'-র ঝোঁক।

প্রচলিত বানানের পরিবর্তে নূতন 'বিশুদ্ধ' বানান-প্রবর্তনের ঝোঁক সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের একটি মন্তব্য তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থের 'বিজ্ঞপ্তি' থেকে উদ্ধার করি। 'গুজরাটী, উড়িয়া' প্রভৃতি না

লিখে কেউ কেউ শব্দগুলির বিশুদ্ধ রূপ দিচ্ছেন 'গুজরাতী, ওড়িয়া'—ভাষাচার্য বলছেন :

> "আমি 'গুজরাটী, উড়িয়া' প্রভৃতি লেখার পক্ষে ; কারণ, এই রূপগুলি বাঙ্গালা ভাষার স্বকীয় প্রাচীন রূপ। মুখে সকলেই এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে, আধুনিক বাঙ্গালায় হঠাৎ ইহাদিগকে বর্জন করিয়া, ইহাদের 'বিশুদ্ধ' রূপ লিখিয়া চক্ষু এবং কর্ণ উভয়েরই উপর উপদ্রব কবিয়া, অনাবশ্যক-ভাবে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা হয় মাত্র।"

'ইআ, এআ' বানান-প্রসঙ্গেও আমাদের অনুরূপ মন্তব্য। 'উআ, ওআ'তে কর্ণ পীড়িত না হলেও চক্ষু পীড়িত হয়। 'অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য'র চূড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে এই বানান-বিধিটি।

উনবিংশ নিয়ম—"s, sh।"

এর আলোচনা আগেই হয়ে গেছে। বৈদেশিক s ধ্বনিতে স, sh-ধ্বনিতে শ লেখার বিধান। তবে বাংলা থেকে ইংরেজী লিপ্যন্তরে কিছু অসুবিধা ঘটছে। শতবর্ষ পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-বিভাগ (বানানসংস্কার-সমিতি নয়) বাঙ্গালী হিন্দু নাম প্রতিবর্ণীকরণের যে-নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন অদ্যাবধি তা চলে আসছে। 'শ, স'-এর প্রতিবর্ণীকরণ s দিয়ে, ষ-এর sh দিয়ে—Asutosh, Syamaprasad, Satischandra Ghosh। আরও একটু জটিলতা আছে। বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় লিপ্যন্তর শ স্থানে sh। Santiniketan-কে অনেকে লেখেন Shantiniketan ; Sri, Shri দুই রূপই চলছে। Calcutta University-র Sri-রও ঐতিহ্য আছে, সর্বভারতীয় Shri-কেও অগ্রাহ্য করা চলে না।

বিংশ নিয়ম—"St স্থানে স্ট।"

পূর্বেই এর আলোচনা হয়ে গেছে।

একবিংশ নিয়ম—"Z স্থানে জ় বা জ বিধেয়।"

এ নিয়মে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। Z-এর উচ্চারণ বাংলা ভাষায় এত বেশী যে একে উপেক্ষা করা চলে না। পরশুরাম লিখেছিলেন "Zান্তি পার না।" কৌতুকের অংশ ছেড়ে দিলেও উচ্চারণ বোঝাতে প্রকৃষ্টতর পন্থা ছিল না। Z-ধ্বনির জন্য বাংলায় উপযুক্ত বর্ণ না থাকায় প্রায়ই 'জ' (কখন কখন 'স'?) দিয়ে ধ্বনিটি প্রকাশ করা হয়। Z-কে লিখতে হয় 'জেড', Zoo-কে 'জু'। আমরা লিখি 'প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্সি'। কিন্তু শব্দদ্বয়ের খাঁটি উচ্চারণ 'প্রেzিডেন্ট, প্রেzিডেন্সি'। S-এর জন্যই স দিয়ে বানান করা হচ্ছে, না, উচ্চারণের অজ্ঞতার জন্য 'সি' লেখা হচ্ছে, না, স দিয়েই Z-এর ধ্বনি বোঝানো হচ্ছে, বলতে পারি না; Portuguese (gēz—C.O.D., P.O.D.) ধ্বনিবিজ্ঞানীদের কলমে 'পোর্তুগীস'। আমাদের মনে হয় Z-ধ্বনির জন্য জ-এ ফুটকি অপেক্ষা জ-এর নীচে সরু দাগ দিয়ে হরফ সৃষ্টি করা ভাল, ফুটকি অনেক সময়ে নজরে পড়ে না।

সংস্কার-সমিতি 'ঐ, ঔ' সম্বন্ধে কোন বিধান দেন নি। শুনেছি, সমিতিতে 'ঐ, ঔ' বর্জনের প্রস্তাবে 'general agreement' হয়েছিল, কিন্তু সেদিন দেবপ্রসাদবাবু সমিতির আলোচনায় যোগ দিয়ে প্রস্তাবটিকে বানচাল করে দেন। আমরা 'ঐ, ঔ' বর্জনের বিরোধী। কারণ 'তৈল, ঔষধ' ছাড়া আমাদের চলে না। অতএব বর্ণদুটির প্রয়োজন আছে। প্রাকৃত বাংলায়ও এই দুই বর্ণ অনাবশ্যক নয়। তবে আমরা দেবপ্রসাদবাবুর যুক্তি তথা দৃষ্টান্ত মানতে প্রস্তুত নই। দেবপ্রসাদবাবু বলেছেন 'বউ, দই' বানানের চেয়ে 'বৌ, দৈ' বানান ভাল, নচেৎ "মউমাছিরা গুঞ্জন করবে, কুকুরগুলো শুধু ভউ ভউ করে ডাকবে, ছেলেরা শুধু দউড়াদউড়ি করবে আর রাস্তার চউমাথায় হই হই রই রই শুনে পুলিশ ফউজ তাড়া করে আসবে।" 'বধূ>বউ, দধি>দই, মধু>মউ'— এতে দোষের কী হল বুঝি না। 'চতুষ্ক>চউ'

দুদিন দেখলেই চোখে সয়ে যায়, তবে এ বানান সমর্থন করছি না। কুকুরগুলি 'ভউ ভউ' করুক কিংবা 'ভৌ ভৌ' করুক, পুলিসের 'ফউজ' আসুক কি 'ফৌজ' আসুক, তাতে বাংলা ভাষার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। ছেলেরা 'দউড়াদউড়ি' করুক এটা অবশ্য আমরা চাই না, 'হই হই রই রই' কিংবা 'হৈ হৈ রৈ রৈ' যা খুশি করতে পারে। 'বৌ' শব্দকে দেবপ্রসাদবাবু monosyllabic বলেছেন। মার্জিত উচ্চারণ diphthongal, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে গ্রামে-গাঁয়ে 'বো-উ' অর্থাৎ প্রলম্বিত উ-ধ্বনিও বেশ শোনা যায়। 'বই' শব্দও monosyllabic, পুস্তক-অর্থে 'বৈ' বানান দেবপ্রসাদবাবু সমর্থন করবেন? সংস্কৃত বর্ণমালার ঋৃ, ঌ, ৡ বাংলায় কোন কাজে লাগে না, অতএব ঐ তিনটি বর্ণ একরকম বর্জিতই হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলে বর্ণতিনটি বাংলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক নয়। এই তিনটি বর্ণ ব্যতীত বাংলা বর্ণমালার আর কোন বর্ণই পরিত্যাজ্য নয়।

'ঐ' স্থলে 'ওই' বানান রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেছেন, এজন্য কেবল রবীন্দ্র-বিরোধীরা নয়, রবীন্দ্র-অনুরাগীরাও কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন। এই দুই বানানেরই যে প্রয়োজন আছে তা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া একটিমাত্র উদাহরণেই সহজে বোঝা যাবে:

> "'ও-ই দেখো খোকা ফাউনটেন পেন মুখে পুরেছে'—এইখানে দীর্ঘ ও-কারে কেউ দোষ ধরবে না। আবার যদি বলি 'ঐ দেখো ফাউনটেন পেনটা খেয়ে ফেললে বুঝি'—তখন হ্রস্ব ঐ-কার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না।"

দুঃখের কথা, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বড় একটি প্রবন্ধ থাকা-সত্ত্বেও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কবির এই নিয়মটি সর্বত্র মেনে চলেন নি, খেয়ালখুশিমতো 'ঐ, ওই' বানান দিয়েছেন। গীতাঞ্জলির 'ঐ রে তরী দিল খুলে' গীতবিতানে 'ওই রে তরী দিল খুলে'। কল্পনার 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' গীতবিতানে 'ওই আসে

ওই অতি ভৈরব হরষে'। সাধারণ লেখায় 'ঐ ওই' বানানের সূক্ষ্ম পার্থক্য হয়তো অনেকে লক্ষ্য করেন না, কিন্তু গানে কবিতায় এই দুই বানান গায়ক-গায়িকা কবি-আবৃত্তিকারদের অনেক ইঙ্গিত দেয়।

পরিশেষে বক্তব্য—এই প্রবন্ধে কতকগুলি বানানের প্রতি লেখকের ঝোঁক নিশ্চয়ই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু ঐসমস্ত বানান প্রচলনই লেখকের উদ্দেশ্য নয়। লেখকের আসল উদ্দেশ্য—১৯৩৭-এর বানান-সংস্কারের পরও বাংলা বানানে যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে সেদিকে সুধীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে আর-একটি শক্তিশালী সংস্কার-সমিতির মাধ্যমে বিকল্প-বিধান কমে গিয়ে স্বৈরাচার শৃঙ্খলিত হয়।

বানান-সমস্যা

দুইটি বহুব্যবহৃত বাংলা শব্দের বানান সম্পর্কে সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'নিচে' না 'নীচে', 'কি' না 'কী'? মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রশ্নপত্রে এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ অপরিহার্য।

আমি এই প্রবন্ধে সাধুভাষাই ব্যবহার করিতেছি, কারণ এই প্রবন্ধে সর্বপ্রথমেই রবীন্দ্রনাথের যে-মতামত উদ্ধৃত করিতে চাই তাহা সাধুভাষায় রচিত।

নিচ ও নীচ

১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' (দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্ধিত) গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় 'নিচ ও নীচ' শীর্ষক একটি নিবন্ধ আছে। নিবন্ধটি ১৯৩৪ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে লিখিত একটি পত্রাংশ। 'রবীন্দ্ররচনাবলী'তে এই পত্রাংশ পাওয়া যায় না বলিয়া সম্পূর্ণ লেখাটাই এখানে উদ্ধারযোগ্য মনে করিতেছি।—

"নীচ শব্দ সংস্কৃত, তাহার অর্থ mean। বাংলায় যে 'নিচে' কথা আছে তাহা ক্রিয়ার বিশেষণ। সংস্কৃত ভাষায় নীচ শব্দের ক্রিয়ার বিশেষণরূপ নাই। সংস্কৃতে নিম্নতা বুঝাইবার জন্য নীচ কথার প্রয়োগ আছে কিনা জানি না। হয়তো উচ্চ নীচ যুগ্মশব্দে এরূপ অর্থ চলিতে পারে—কিন্তু সে স্থলেও যথার্থত নীচ শব্দের তাৎপর্য moral, তাহা physical নহে। অন্তত আমার সেই ধারণা। সংস্কৃতে নীচ ও নিম্ন দুই ভিন্ন বর্গের শব্দ—উহাদিগকে একার্থক করা যায় না। এই জন্য বাংলায় নীচে বানান করিলে below না বুঝাইয়া to the mean বুঝানোই সঙ্গত হয়। আমি সেই জন্য 'নিচে' শব্দটিকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত বাংলা

বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকি। প্রাচীন প্রাকৃতে বানানে যে রীতি আছে আমার মতে তাহাই শুদ্ধ রীতি; ছদ্মবেশে মর্যাদাভিক্ষা অশ্রদ্ধেয়। প্রাচীন বাংলায় পণ্ডিতেরাও সেই নীতি রক্ষা করিতেন, নব্য পণ্ডিতদের হাতে বাংলা আত্মবিস্মৃত হইয়াছে।”

দৃঢ় প্রত্যয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন—সুতরাং 'নীচে' বানানের পরিবর্তে 'নিচে' বানানই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'স্থির আসন' স্থাপন করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায়—

(১) সংস্কৃতে 'নীচ' শব্দের অর্থ 'mean'—কখনও 'below' নহে।

(২) সংস্কৃতে নিম্নতা বুঝাইবার জন্য 'নীচ' কথার প্রয়োগ আছে কিনা তিনি জানেন না। প্রয়োগ থাকিলেও 'উচ্চ নীচ' যুগ্ম শব্দে এইরূপ অর্থ চলিতে পারে, কিন্তু সে-স্থলেও 'নীচ' শব্দের তাৎপর্য 'moral', তাহা 'physical' নহে।

(৩) সংস্কৃতে 'নীচ' ও 'নিম্ন' একার্থক নহে।

(৪) সংস্কৃতে 'নীচ' শব্দের 'ক্রিয়ার বিশেষণ' রূপ নাই।

অর্থাৎ 'below' অর্থে সংস্কৃতে 'নীচ' শব্দের প্রয়োগ নাই বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ শব্দটির প্রাকৃত বানান যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন।

আমাদের আশঙ্কা—রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত তথ্যসমৃদ্ধ নয়। সংস্কৃত ভাষা হইতে কয়েকটি বাক্য বা বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিতেছি যেখানে 'নীচ' শব্দে 'নিম্নতা'-ই বুঝায়, কদাপি 'mean' বুঝায় না।

চৈতন্যদেবের শ্লোকাষ্টকের সেই বিখ্যাত শ্লোকটিই সর্বাগ্রে স্মরণ করি—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—এখানে 'নীচ' অর্থ 'mean' নহে; 'নীচ' অর্থ নিম্নস্থান; এবং এই নিম্নতা 'moral'-ও নয়, 'physical'-ই।

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতম্' হইতে একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করি—

'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।'

—এখানেও 'নীচ' mean নয়,—below। তবে উচ্চ নীচের কথা আছে বটে, কিন্তু যুগ্ম শব্দ নাই। আর অর্থ তো একেবারেই moral নয়, সম্পূর্ণ physical।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করি—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥

সংক্ষেপে ইহার অর্থ—শুদ্ধ স্থানে [যোগী] প্রথমে কুশ, তদুপরি যথাক্রমে মৃগচর্ম ও বস্ত্রদ্বারা রচিত নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্বীয় স্থির আসন স্থাপন করিবেন। এখানেও উচ্চ-নীচের কথা আছে বটে কিন্তু আসনের স্থান moral নয়, physical।

মনুসংহিতায় (২/১৯৮) আছে 'নীচং শয্যাসনম্'।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে দেখিতেছি—'নিম্নস্থান-স্থিত' অর্থে ঋগ্‌বেদেও (১০. ৩৪. ৯) 'নীচ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

অতঃপর 'নিচে' বানান কতটা যুক্তিসঙ্গত বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"সংস্কৃত ভাষায় নীচ শব্দের ক্রিয়ার বিশেষণরূপ নাই।" কথাটা অবশ্য 'সংস্কৃত ভাষায়' ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপ নয়, 'বাংলা ভাষায়' ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপ। সংস্কৃত ভাষার অব্যয়পদ 'নীচৈঃ' প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পূর্বে দেখানো হইয়াছে। এই মত যদি মানিতে হয়, তবে বাংলা ভাষায় 'ধীরে' শব্দটির বানানেও হ্রস্ব-ইকার লাগাইতে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিশ্বভারতী

গ্রন্থনবিভাগ অদ্যাবধি 'ধিরে' বানান চালু করেন নাই। রবীন্দ্রনাথেরই আকৃতি—

'ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া'।

এই প্রসঙ্গে জানাইয়া রাখি—রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানসংস্কার-সমিতি'র সভাপতি, রাজশেখর বসু তাঁহার 'চলন্তিকা' অভিধানে 'নিচে' শব্দটিকে স্থান দেন নাই।

কি ও কী

মজার কথা এই—আধুনিক সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মান্য করিয়া প্রাকৃত শব্দে নির্মমভাবে দীর্ঘ-ঈকার বর্জন করিলেও যত্রতত্র দীর্ঘ-ঈকার বসাইয়া 'কী' লিখিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। আবার প্রাচীনপন্থীরা প্রাণপণে 'কি' বানানে হ্রস্ব-ইকার আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন। অতএব কোথায় 'কি', কোথায় 'কী' বানান সমীচীন, একটু আলোচনা করিলে মন্দ হয় না। এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে কিন্তু প্রবীণ নবীন কাহারও সেদিকে দৃক্‌পাত নাই।

রবীন্দ্রসূত্র উল্লেখের পূর্বে রক্ষণশীল দলের দীর্ঘ-ঈকার-বিরোধিতার কারণ অনুসন্ধান করি। ইঁহারা বলেন—

(১) 'কী' নব্য বানান, সংস্কারবিলাসীদের উৎকট সৃষ্টি।

(২) সংস্কৃত 'কিম্' শব্দ হইতে আগত, অতএব 'কি' বানানই সঙ্গত।

(৩) দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য না হয় 'কী' লেখা গেল কিন্তু প্লুত উচ্চারণ কেমন করিয়া বুঝানো যাইবে? অতএব হ্রস্ব-ইকে দীর্ঘ-ঈ করার কিছুমাত্র যৌক্তিকতা নাই।

(৪) একই বানানে শব্দের বহুবিধ অর্থ হইতে পারে—প্রসঙ্গ অনুধাবন করিয়াই শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়।

এইবার যুক্তিসমূহের মূল্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করি।—

(১) 'কী' নব্য বানান নহে। অনেকের ধারণা—রবীন্দ্রনাথ এই বানান প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু সে ধারণা ঠিক নহে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'কী' বানানের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি-পদাবলীতে, গোবিন্দদাসের পদাবলীতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, ময়নামতীর গানে, মহারাষ্ট্রপুরাণে, পদ্মাপুরাণে দীর্ঘ-ঈকারান্ত 'কী' শব্দের অজস্র প্রয়োগ আছে। অতএব 'কী' হালের বানান নহে। তবে একথা ঠিক যে প্রাচীন পদকর্তারা নির্বিচারে 'কি' ও 'কী' ব্যবহার করিয়াছেন—কোনপ্রকার অর্থ-বৈলক্ষণ্য দেখান নাই। বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথই অর্থ-পার্থক্য দেখাইয়া 'কী' বানান প্রচলন করিয়াছেন।

(২) সংস্কৃত 'কিম্' হইতে উদ্ভূত বলিয়াই 'কি' বানানে সর্বদা হ্রস্ব-ই ব্যবহার করিতে হইবে এ যুক্তি অচল। সংস্কৃত 'কীদৃক্, কীদৃশ' প্রভৃতি শব্দও 'কিম্' শব্দ হইতে আগত। এইসব শব্দের দীর্ঘ-ঈকার যদি অসহনীয় না হয়, বাংলা 'কী' বানানকেও রীতিবিরুদ্ধ বলা চলে না।

(৩) লৈখিক ভাষার বর্ণবিন্যাসে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ প্রকাশের ব্যবস্থা আছে, প্লুত উচ্চারণের জন্য কোন বর্ণ সৃষ্ট হয় নাই। ফলে হ্রস্ব বর্ণেও প্লুত উচ্চারণ হয়, দীর্ঘ বর্ণেও প্লুত উচ্চারণ হয়। 'কেষ্ট, মনা, হরি, কালী, কানু, কে, ওগো' প্রভৃতি শব্দের প্লুত উচ্চারণের জন্য বিশেষ বানানের দুশ্চিন্তা যখন কাহারও নাই, তখন 'কি' আর 'কী'র জন্য দুর্ভাবনা একেবারেই অনাবশ্যক।

(৪) "মত মতো, ভাল ভালো, করে ক'রে, হল হ'ল" প্রভৃতি বানানে ও-কার বা ইলেকচিহ্ন না দিলেও হয়তো প্রসঙ্গ দেখিয়া শব্দের অর্থ-বোধ হয়, কিন্তু 'কি' আর 'কী' সে শ্রেণীর শব্দ নহে। মৌখিক উচ্চারণ-ভঙ্গিতে শব্দদ্বয়ে অর্থপার্থক্য যত স্পষ্ট হয়, লৈখিক বর্ণবিন্যাসে হ্রস্ব দীর্ঘ প্রয়োগ না করিলে অর্থপার্থক্য তত স্পষ্ট করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। 'তুমি কি খাবে? সে কি পাখি পোষে? কলমটায় কি

কালি আছে? পূজার জন্য কি ফুল আনা হয়েছে? আজ কি রান্না হবে?' প্রভৃতি বাক্যে অর্থ স্পষ্ট নহে। 'তুমি খাবে কিনা, কিংবা কোন্ বস্তু খাবে? সে পাখি পোষে কিনা, কিংবা কোন্ পাখি পোষে? কলমটায় কালি আছে কিনা, কিংবা কোন্ কালি আছে? পূজার জন্য ফুল আনা হয়েছে কিনা, কিংবা কোন্ ফুল আনা হয়েছে? আজ রান্না হবে কিনা, কিংবা কোন্ বস্তু রান্না হবে?' ইত্যাদি দুইপ্রকার অর্থই হইতে পারে। কিন্তু বানানে হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্য ঘটাইলে অর্থবোধে কোন বাধা থাকে না।

প্রাচীনপন্থীদের যুক্তি হয়তো খণ্ডন করা গেল, কিন্তু যাঁহারা সংস্কারবিরোধী নহেন তাঁহাদের সঙ্গেও আলোচনা আবশ্যক।

আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান 'চলন্তিকা'। চলন্তিকায় 'কী' শব্দ আছে, কিন্তু অর্থ দেওয়া হইয়াছে: "বেশী জোর দিতে, যথা—কী সুন্দর! তোমার কী হয়েছে?" আরও কোন কোন অভিধানে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। মৌখিক ভাষায় আমরা শুধু 'কি' শব্দের উপরই জোর দিই না, অন্যান্য শব্দের উপরও জোর দিয়া থাকি। কিন্তু সেজন্য লৈখিক ভাষায় ঐসমস্ত শব্দের বানান-পরিবর্তন আবশ্যক হয় না, কেবল 'কি' শব্দের বেলাই বানান-পরিবর্তন হইবে কেন? 'তুমি খেয়েছ কিনা' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমরা বলি "তুমি কি খেয়েছ?"—জোর দেওয়া হয় 'খেয়েছ' শব্দের উপর। কিন্তু তুমি যদি উত্তর না দেও, কিংবা উত্তর দিতে বিলম্ব কর, তখন বিরক্ত হইয়া একই প্রশ্ন একটু পাল্টাইয়া বলি "তুমি খেয়েছ কি?"—এবার জোর পড়িতেছে 'কি' শব্দের উপর। এইজন্য যদি 'কি' শব্দের বানান বদলাইতে হয়, তাহা হইলে 'তুমি' শব্দের উপর জোর দিলে 'তুমি' শব্দেরও বানান বদলাইতে হয়। অতএব 'বেশী জোর দিতে দীর্ঘ-ঈকার' এই যুক্তি মনঃপূত হইতেছে না।

জোর দেওয়ার জন্য বানান-পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই, কিন্তু

অর্থভেদে বানান-পরিবর্তন আবশ্যক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে 'কী' প্রাচীন পদাবলীর বানান হইলেও আধুনিক যুগে এই বানান প্রচলিত করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এই বানান-সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহাই যুক্তিসঙ্গত বিচার। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করি—

> "প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কি' এবং প্রশ্নসূচক সর্বনাম 'কি' উভয়ের কি এক বানান থাকা উচিত? আমার মতে বানানের ভেদ থাকা আবশ্যক। একটাতে হ্রস্ব-ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ-ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝার সুবিধা হয়। 'তুমি কি রাঁধছ' 'তুমি কী রাঁধছ'—বলা বাহুল্য এ দুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। তুমি রাঁধছ কিনা, এবং তুমি কোন্ জিনিষ রাঁধছ, এ দুটো প্রশ্ন একই নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে।"

অর্থাৎ শব্দটি অব্যয়রূপে প্রযুক্ত হইলে বানান হইবে 'কি', সর্বনাম বা সর্বনামজাত বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে বানান হইবে 'কী'। 'বেশী জোর' দেওয়ার যুক্তি আমদানি করিলে শব্দটি অনর্থক পীড়িত হয়; একই অর্থে, বাক্যমধ্যে শব্দের স্থান পরিবর্তন করিলে বানানেরও পরিবর্তন করিতে হয়।

সাহিত্যিকেরা নিরঙ্কুশ। বানান-সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর বা ইচ্ছা হয়তো তাঁহাদের অনেকেরই থাকে না। কিন্তু যেসমস্ত অধ্যাপক বা শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মধ্যশিক্ষাপর্ষদের প্রশ্নকর্তা তাঁহারা প্রশ্নপত্রে নির্বিচারে 'কি' শব্দ প্রয়োগ করিলে পরীক্ষার্থীরা বিপন্ন হয়। প্রায়ই দেখা যায়, সাহিত্য-রচনায় অধ্যাপকেরা যতই আধুনিক হউন, প্রশ্ন-রচনাকালে তাঁহারা অতিমাত্রায় প্রাচীন পন্থার ভক্ত হইয়া পড়েন।

হস্-বর্জন প্রহসন

'What Bengal thinks today, the rest of India thinks tomorrow'—এই বিখ্যাত উক্তি দ্বারা একদা বাঙ্গালীকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালীকে এত বড় শ্রদ্ধার সম্মান দিয়াছিলেন যিনি তাঁহার নাম বাঙ্গালী শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। এই মনীষীকে কেহ বলেন 'গোখ্‌লে', কেহ বলেন 'গোখেল'। দুইটিই ভুল। শুদ্ধ উচ্চারণে খ হইবে অ-কারান্ত: গো—(খ্‌+অ=)খ—লে। ইংরেজী বানানে কিন্তু ভুল নাই—Go-kha-le। কিন্তু প্রতি-বর্ণীকরণ না বুঝিয়া আমরা উচ্চারণে ভুল করি। ইংরেজী male= মেইল, pale=পেইল, sale=সেইল, tale=টেইল—আমাদের মুখে দাঁড়াইয়াছে মেল, পেল, সেল, টেল। অনুরূপভাবে khale-কে আমরা উচ্চারণ করি 'খেল'—অর্থাৎ ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া আমরা বলি 'গোখেল'।

কিন্তু আমরা 'গোখ্‌লে' কেন বলি ঠিক্ বুঝিতে পারি না। বাংলা উচ্চারণে অ-ধ্বনি লোপের বহু দৃষ্টান্ত আছে সত্য, কিন্তু নামপদ এ-কারান্ত ত্র্যক্ষর শব্দ হইলে মধ্যাক্ষরে অ-লোপের দৃষ্টান্ত দুই-একটির বেশি খুঁজিয়া পাই না। সকলে, দখলে, বগলে, অনলে, গোধনে, গোপনে, গোরসে, গোলকে শব্দগুলিকে কখনও সক্‌লে, দখ্‌লে, বগ্‌লে, অন্‌লে, গোধ্‌নে, গোপ্‌নে, গোর্‌সে, গোল্‌কে উচ্চারণ করি না। ক্রিয়াপদে আমরা অবশ্য বলি—বল্‌লে, কর্‌লে, গড়্‌লে, দেখ্‌লে। শব্দগুলি সহজবোধ্য বলিয়া আমরা এগুলিকে হস্-বর্জিত বানানে লিখি—বললে, করলে, গড়লে, দেখলে। এই দৃষ্টান্তেও হইতে পারে কিংবা হিন্দী প্রভাবেও হইতে পারে, গোখলে আমাদের মুখে হইয়াছেন গোখ্‌লে।

আজকাল সর্বত্র দেখিতেছি চিহ্ন-বর্জনের পালা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায় সেমিকোলন, বিস্ময়-সঙ্কেত, প্রশ্ন-সঙ্কেত প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলিকে বর্জনের নির্দেশ দিয়াছেন। আবার 'সূক্ষ্ম বিচার' করিয়া একটি চিহ্নের অভিনব প্রয়োগও দেখাইয়াছেন। চিহ্নটি হইতেছে হাইফেন—'যে' শব্দ উপস্থিত থাকিলে। 'তুমি-যে কাজে লেগেছ', 'তুমি যে-কাজে লেগেছ'। ইলেক বা ঊর্ধ্বকমার* যে ছড়াছড়ি ছিল তাহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে ও-কার স্থানে-অস্থানে জাঁকিয়া বসিতেছে। 'ছিল, গেল' ও-কারভূষিত হইয়া নবকলেবরে দেখা দিয়াছে—ছিলো, গেলো। অবশ্য এইসব প্রবেশ-প্রস্থানের প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিতে চাই না—আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা হইতেছে হস্-চিহ্ন বর্জন সম্বন্ধে।

তদ্ভব শব্দ বা অর্ধতৎসম শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। ঐসকল শব্দের বর্ণবিশেষ হস্-চিহ্নবিহীন হইলেও আমরা প্রয়োজনমতো তাহার হসন্ত উচ্চারণ করিতে পারি। বৈদেশিক শব্দ আমাদের সকলের কাছে সমভাবে পরিচিত নয়, এইজন্য বৈদেশিক শব্দে স্থানবিশেষে হস্-চিহ্নের প্রয়োজন আছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করিতেছি। কিন্তু তৎসম শব্দের প্রয়োজনীয় হস্-চিহ্নের বর্জন যে কেবল অযৌক্তিক তাহা নহে—উহা মূঢ়তাব্যঞ্জক, অপরাধজনক।

---

*Apostrophe শব্দের বাংলা কী? শব্দটি এত গুরুভার যে এযাবৎ এই ইংরেজী শব্দটি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ 'ইলেক' শব্দ দিয়া কাজ চালাইয়াছেন যদিও শব্দটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—

"ইংরেজিতে যে-চিহ্নকে অ্যাপসট্রফির চিহ্ন বলে কেউ কেউ বাংলা পারিভাষিকে তাকে বলে 'ইলেক', এ আমার নতুন শিক্ষা। এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি দায়িক নই।"

কেহ কেহ বাংলা করিয়াছেন 'ঊর্ধ্বকমা'। কিন্তু Comma-ও ইংরেজী শব্দ এবং 'ঊর্ধ্ব' শব্দটি তো বেশ ভারী। যে-যুগে শব্দটির সৃষ্টি হইয়াছিল, সে-যুগে শব্দটি লম্বায় চওড়ায় ওজনে যাহা ছিল তাহাতে তো রীতিমতো হৃৎকম্প উপস্থিত হইত—'ঊর্ধ্ব'-কমা।

দিক্, ধিক্, পৃথক্, সম্যক্, ত্বক্, বাক্, বিরাট্ (<বিরাজ্), সম্রাট্, আপদ্, বিপদ্, সম্পদ্, পরিষদ্, সভাসদ্, মহান্, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, শক্তিমান্, শ্রীমান্, হনূমান্, ভগবান্, ধনবান্ প্রভৃতি শব্দে হস্-চিহ্ন না দিলে পণ্ডিতদের কোন অসুবিধা হয়তো হয় না—তাহার কারণ তাহারা জানেন, এসকল শব্দের অন্তে হস্-চিহ্ন আছে, বাহুল্যবোধে বর্জন করা হইয়াছে মাত্র। তবে পণ্ডিতদের কিছুতেই অসুবিধা হয় না। যদি লিখি 'বহিপ্র্কৃতি, নভোতল, শিরচ্ছেদ, লজ্জাস্কর, দুরাদৃষ্ট, অন্তরেন্দ্রিয়, বাগেশ্বরী, পুরষ্কার, পরিস্কার, শ্রদ্ধাস্পদ, সর্বাঙ্গীন, উচিং, কুংসিং' পণ্ডিতেরা অনায়াসেই বোঝেন—লেখক অজ্ঞান, তাহার সন্ধি-জ্ঞান নাই, ষত্বণত্ব-জ্ঞান নাই, প্রকৃতিপ্রত্যয়-জ্ঞান নাই। কিন্তু বিপদে পড়ে শিক্ষার্থীরা। কারণ, শিক্ষার্থীরা সচরাচর অজ্ঞানই থাকে, তাহারা স্কুলেই পড়ুক কলেজেই পড়ুক, বিদেশী ভাবাভাষীই হউক। শুদ্ধ বানান পণ্ডিতের জন্য আবশ্যক নহে, শিক্ষার্থীর জন্য এবং বিশেষভাবে বিদেশী শিক্ষার্থীর জন্য অত্যাবশ্যক। পুস্তকে বানান শুদ্ধ না থাকিলে যদি শিক্ষার্থীরা সন্ধি-সমাসে, ষত্ব-ণত্বে ভুল করে, তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন 'পৃথকান্ন, বিপদোদ্ধার' লেখে, তখন মাস্টারমহাশয়েরা কেন চটেন, বুঝি না। এই সন্ধিগুলির পূর্বাংশে যে হসন্ত বর্ণ আছে, তাহা তাহারা জানিবে কেমন করিয়া? শিক্ষার্থীরা বইয়ের বানান দেখিয়াই শব্দের বানান শেখে, ব্যাকরণ পড়িয়া নহে। হস্ অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন, পায়ের তলায় থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্র বলিয়া অনাবশ্যক নহে, পায়ের তলায় থাকে বলিয়া তুচ্ছ নহে। চিহ্নটি না থাকিলে শব্দবিশেষের ব্যুৎপত্তি সব সময়ে বোধগম্য হয় না। মতুপ্-এর 'মান্' ও শানচ্-এর 'মান' যে পৃথক্ বস্তু, হস্-চিহ্ন না থাকিলে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সব সময়ে ধরিতে পারেন না। চিহ্নটি উপস্থিত থাকিলে পাণ্ডিত্য-প্রকাশে অধিক বিলম্ব হয় না। হস্-চিহ্নের অমনোযোগিতায় 'ষড়্ঋতু, ষড়্জ, ষড়্দর্শন, ষড়্যন্ত্র, ষড়্রিপু, ষড়্বিধ' শব্দগুলির ভুল উচ্চারণ বড় বড় পণ্ডিতের

মুখেও শুনিয়াছি। হস্-চিহ্ন না থাকিলে 'অষ্টক'-ধ্বনি অনুযায়ী 'ষট্‌ক' ষটক্ হইয়া যাইতে পারে (sestet ষষ্ঠক বা ষড়ক নহে, ষট্‌ক)। খড়্গপুর আমাদের মুখে খড়্গ্‌পুর হইয়া গিয়াছে ; যাহারা সাহেব তাহারাও বলে, যাহারা সাহেব নহে তাহারাও বলে—তবে খড়্গপুরের অধিবাসীরা উচ্চারণ-বিকার ঘটায় নাই।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি কথা মনে আসিতেছে। নব্য শিক্ষার্থীরা 'পরিষদ্' ও 'পারিষদ' শব্দদ্বয়ে ভুল করে কিন্তু নব্য লেখকেরা আর একটা নূতন ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছেন পশ্চিমবঙ্গে 'মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ' বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান আছে। প্রায় সর্বত্রই দেখি, 'এ' বা 'এর' বিভক্তির প্রয়োজনে ইহাকে 'মধ্যশিক্ষাপর্ষতে, পর্ষতের' লেখা হইতেছে, যদিও 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' এখন পর্যন্ত এই 'বিপতে' পড়ে নাই। দ-কারান্ত একটিমাত্র শব্দ মনে পড়িতেছে যাহাকে এ বা এর বিভক্তি যুক্ত করিয়া আমরা তে বা তের বলি ; সে-শব্দটি শরৎ। কিন্তু 'বিপতে, আপতে, নিরাপতে, সম্পাতে, উদ্ভিতে, সুহৃতের, সংসতের, পরিষতের, সভাসতের, উপনিষতের' এইরূপ বানান অদ্যাবধি দেখি নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টান্ত মধ্যশিক্ষা-পর্ষদে আনিতে দোষ কী ?

পরিশেষে বাংলাদেশের একটি অতি-বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের একদিনের একটি সংখ্যা হইতে কয়েকটি বিদেশী শব্দের বানান উদ্ধার করিতেছি। পাঠক যদি শব্দগুলি তাড়াতাড়ি পড়িয়া যাইতে পারেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই কৃতীপুরুষ বলিব—

মেকারসের, সিমেনট, কেবলস, রেকরড, রিজারভ, ফারসট, টেসট, স্পোরটস, মিলস, জামপ, নরদারন, ফোরথ, নবেমবর, বোরড—আর থাক। শব্দগুলি বোধ হয় makers-এর, cement, cables, record, reserve, first, test, sports, mills, jump, northern, fourth, November, Board.

এই বানানগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেও ইচ্ছা হয় না। ইহার অপেক্ষা রোমান হরফে lekha anek bhalo।

আমাদের একটা আশঙ্কা হয়, হস্‌-চিহ্ন বর্জনের প্রেরণা পাইয়াছি আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুনন্দিত ও বহুনিন্দিত ১৯৩৭ সালের বানান-বিধান হইতে। এই বানান-সংস্কারের ৪ নং নিয়মে অসংস্কৃত শব্দে হস্‌-চিহ্ন প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্‌-চিহ্ন দেওয়া হইবে না।" যাঁহারা এই বিধি দিয়াছেন, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দের কথা বলেন নাই, অসংস্কৃত শব্দের কথাই বলিয়াছেন, এবং অসংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধেও যতবারই বলিয়াছেন, ততবারই 'অন্ত্য অ, শেষ অক্ষর, শব্দের শেষে অ' প্রভৃতি ব্যক্ত করিয়া হস্‌-চিহ্ন বর্জনের নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা যখন একবার বসিবার জায়গা পাইয়াছি, শুইবার জায়গা যেমন করিয়াই হউক করিয়া লইব। অবশ্য নিয়মের লৌহঘরে একটি রন্ধ্রও ছিল, সেই রন্ধ্র দিয়াই সর্প প্রবেশ করিয়াছে। "কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে, তবে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়"—আমাদের মতে 'ভুল উচ্চারণ' না বলিয়া 'শব্দের গঠনবোধের অসুবিধা' বলা যুক্তিসঙ্গত ছিল। উচ্চারণের কথা অন্য কারণেও বলা চলে না। যেমন, দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে 'শাহ্‌'—হস্‌-চিহ্নযুক্ত হ। 'শাহ' লিখিলে উচ্চারণে ভুল হইতে পারে। কিন্তু বহু প্রবীণ সংস্কৃত পণ্ডিতের মুখেও উচ্চারণ শুনিয়াছি 'বহ ধাতু, সহ ধাতু, দ্রুহ ধাতু'—বহ্‌, সহ্‌, দ্রুহ্‌ নয়। অতএব উচ্চারণের কথা আসে না। অন্যান্য দৃষ্টান্তও অসাবধানে রচিত হইয়াছে। 'বণ্ড্‌' শব্দে হস্‌-চিহ্ন লাগিবে, কিন্তু 'স্পঞ্জ' শব্দে হস্‌ লাগিবে না। কারণ দেখানো হইয়াছে, 'স্পঞ্জ' সুপরিচিত শব্দ কিন্তু 'বণ্ড' শব্দের উচ্চারণে ভুল হইতে পারে। তাজ্জব! Bond বুঝি না, Sponge বুঝি! যাঁহারা বুঝিবেন, তাঁহারা দুইটাই বুঝিবেন। যাহারা বুঝিবে না, তাহারা একটাও বুঝিবে না। শিশুরা পড়িবে—খণ্ড, গণ্ড, বণ্ড, খঞ্জ, গঞ্জ, স্পঞ্জ। হস্‌-চিহ্ন দিতে যদি হাতে ব্যথা না লাগে, দুইটাতেই হস্‌-চিহ্ন দিতে হইবে। নচেৎ 'বণ্ড্‌'-ও পণ্ড হইবে, 'স্পঞ্জ্‌'-ও খঞ্জ হইবে।

বর্ণ-বিভ্রান্তি

শিক্ষকমাত্রেই জানেন হ্‌+ন=হ্ন, হ্‌+ণ=হ্ণ; অর্থাৎ হ-এর সঙ্গে দন্ত্য-ন যুক্ত হইলে ন-এর চিহ্ন থাকে পাশে, মূর্ধন্য-ণ যুক্ত হইলে ণ-এর চিহ্ন থাকে নীচে। অহ্ন, সায়াহ্ন, চিহ্ন, বহ্নি শব্দগুলিতে হ-এর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে দন্ত্য-ন; আর প্রাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ শব্দগুলিতে হ-এর সঙ্গে আছে মূর্ধন্য-ণ।

কিন্তু বাজারে একটি টাইপ চালু দেখা যায়—হ্ণ। হ্ণ এবং হ্ণ টাইপ দুইটির পার্থক্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয় টাইপটির নীচের অংশে একটি স্পষ্ট দন্ত্য-ন। তথাপি অধিকাংশ পুস্তকেই, এমনকি প্রামাণিক ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থেও হ্ণ স্থলে হ্ণ টাইপের ব্যবহার দেখা যায়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত হয়। এই টাইপটির চেহারা দেখিয়া নূতন শিক্ষার্থীরা মনে করে হ-এর তলায়ই থাকে দন্ত্য-ন, অতএব হ্ন=হ্‌+ণ। এই বিভ্রান্তি স্বাভাবিক, এবং এই ভ্রমের জন্য শিক্ষার্থীর চক্ষুকেও দায়ী করা যায় না, যুক্তিকেও দোষ দেওয়া যায় না। বহু টাইপ দেখিয়াছি যেখানে হ-এর তলায় দন্ত্য-ন চিহ্ন আরও স্পষ্ট। আর এখানে যে মূর্ধন্য-ণযুক্ত টাইপটি দেখানো গেল তাহাও অবশ্য আদর্শ টাইপ নহে।

দুঃখের বিষয়, যেসমস্ত লেখককে আমরা Purist মনে করি, যাঁহাদের সম্পাদনাকে আমরা অভ্রান্ত মনে করি, তাঁহারাও তাঁহাদের পুস্তকে নির্বিচারে হ্ণ স্থলে হ্ণ টাইপকে গ্রহণ করিতেছেন। এইসমস্ত প্রবীণ গ্রন্থকার প্রুফ সংশোধন-কালে ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন, না, ফাউণ্ড্রিতে যে-টাইপ ঢালাই হইয়া রহিয়াছে অপ্রতিবাদে তাহাই মানিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, জানি না। এমন নয় যে ছাপাখানায় শুদ্ধ টাইপ পাওয়া যায় না। উপস্থিত প্রবন্ধেই দেখা যাইবে যে শুদ্ধ

টাইপ, অশুদ্ধ টাইপ পাশাপাশি চলিতেছে। অবশ্য একথা সত্য ফাউণ্ড্রিতে ভুল টাইপই ঢালাই হইতেছে বেশী এবং ছাপাখানায় এই টাইপটিই প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হয়। কিন্তু লেখক যদি ইচ্ছা করেন, ছাপাখানার সাহায্যেই ফাউণ্ড্রি হইতে শুদ্ধ টাইপ সংগ্রহ করিতে পারেন। অসতর্ক লেখকদের কথা বলি না, নিষ্ঠাবান্ লেখকেরা যদি সঙ্কল্প করেন, তাঁহাদের রচনায় তাঁহারা অশুদ্ধ টাইপকে স্থান দিবেন না, ভবিষ্যতে ফাউণ্ড্রিতেও আর ভুল টাইপ ঢালাই হইবে না।

এই শ্রেণীর আর-একটি অশুদ্ধ টাইপ আছে—ক্ষ্ন। সকলেই জানেন ক্+ষ=ক্ষ। ষ-এর সঙ্গে কখনও দন্ত্য-ন যুক্ত হইতে পারে না, অতএব ক্ষ-এর সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত থাকিবে মূর্ধন্য-ণ (ক্ষ্ণ), কদাপি দন্ত্য-ন নয়। ফাউণ্ড্রির অক্ষর-নির্মাতারা অজ্ঞতাবশতঃ ক্ষ্ন ঢালাই করেন। শিক্ষক-অধ্যাপকেরা যদি প্রেসের মালিকদের একটু চাপ দিয়া জানাইয়া দেন যে টাইপটি অশুদ্ধ, তাহা হইলে এই অবাঞ্ছিত টাইপটিও নির্বাসিত হইতে পারে। তবে একার চেষ্টায় হইবে না, এজন্য আবশ্যক প্রভাবশালী লেখকদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস।

আর-এক প্রসঙ্গে আসি। সেদিন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধানশিক্ষক কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই বলিলেন, "জানেন, বিশ্বভারতী ব-এ য-ফলা আ-কার দিয়ে 'ব্যাবসা' বানান করে!" আমি বলিলাম, "ওটা ব-এ য-ফলা আ-কার নয়—অ্যা-কার অর্থাৎ এ-কারের বিকৃত উচ্চারণ।" উত্তরে শিক্ষকমহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন না। সন্তুষ্ট অবশ্য আমিও নহি, তবে উত্তরটি খাঁটি।

তৎসম 'ব্যবসায়' শব্দে ব-এ কেবল য-ফলা আছে। ভগ্নতৎসম শব্দেও কেবল য-ফলা থাকিলে, অর্থাৎ 'ব্যবসা' বানান করিলে কিছু দোষ হইত বলিয়া মনে করি না। কিন্তু উচ্চারণানুযায়ী বানানের অভিপ্রায়ে য-ফলার পরিবর্তে অ্যা-কার দিয়া 'ব্যাবসা' বানান করা হইয়াছে। এখানে ্যা-চিহ্নকে য-ফলা আ-কার মনে না করিয়া

অ্যা-কার অর্থাৎ এ-কারের বিবৃত ধ্বনি বুঝিতে হইবে। এই বানান-পরিবর্তনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি না, তবে ্যা-চিহ্ন যে সর্বত্র য-ফলা আ-কার নহে, সময়ে সময়ে উহা অ্যা-ধ্বনির প্রতীক, সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

ত্যাগ, ব্যাধ, শ্যাম, ন্যায়—এই তৎসম শব্দগুলির বানানে ত, ব, শ, ন-এ য-ফলা আ-কার আছে; কিন্তু ম্যাপ, গ্যাস, ছ্যা ছ্যা, ভ্যা ভ্যা—এই অ-তৎসম শব্দগুলির বানান হইয়াছে উচ্চারণানুগ। এই শব্দগুলিতে যে ্যা-চিহ্ন দেখা যায়, তাহা য-ফলা আ-কার নহে, অ্যা-কার। বেটা, ঠেঁটা, টেরা, নেড়া, লেজ, পেঁচা, বেঙ, দেখো, ফেলো বানানে বহু লেখক তৃপ্তিবোধ করেন না—তাঁহারা লেখেন ব্যাটা, ঠ্যাঁটা, ট্যারা, ন্যাড়া, ল্যাজ, প্যাঁচা, ব্যাঙ, দ্যাখো, ফ্যালো। এই ্যা-চিহ্ন নিশ্চয়ই য-ফলা আ-কার নহে; স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় এইসমস্ত শব্দে লেখকেরা ে-চিহ্নের পরিবর্তে ্যা-চিহ্ন পছন্দ করিতেছেন উচ্চারণের খাতিরে। এইসমস্ত স্থলে এ-কার যে সংবৃত নয়, বিবৃত অর্থাৎ সংস্কৃতের মূল স্বরধ্বনি অতিক্রম করিয়া বাংলায় যে নূতন একটা স্বরধ্বনি আসিয়াছে, ্যা-চিহ্ন দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ-কারের বিবৃত ধ্বনি বুঝাইবার জন্য একটা পৃথক্ চিহ্নের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। আদ্যাক্ষরের 'এ'-ধ্বনি বিবৃত হইলে দুই-এক শ্রেণীর শব্দে রবীন্দ্রনাথ ে-চিহ্নের পরিবর্তে ে-চিহ্ন দিয়া ধ্বনি-পার্থক্য বুঝাইয়া দিতেন—'খেলি ফেলি' কিন্তু 'খেলা ফেলা'। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীতে অদ্যাপি এই রীতি অনুসৃত হইতেছে। তবে একথা ঠিকই ে-চিহ্ন ও ে-চিহ্নের সূক্ষ্ম পার্থক্য খুব কম পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; আর ্যা-চিহ্ন যে কখন্ য-ফলা আ-কার, কখন্ এ-কারের বিবৃত উচ্চারণ তাহা অনুধাবন করিতে হইলে যৎকিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞানও আবশ্যক হয়।

বাংলায় শুদ্ধ স্বরধ্বনি সাতটি—অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। অ্যা স্থলে কেহ কেহ লেখেন এ্যা; যেমন—অ্যাঁ এ্যাঁ, অ্যাদ্দিন এ্যাদ্দিন,

অ্যাটম এ্যাটম। অ বা এ স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণের সহিত যে একটা ব্যঞ্জনবর্ণ—য-ফলা—আবার একটা আ-কার সংযুক্ত হইতে পারে না, ইহা সাধারণ বুদ্ধির কথা। আসল কথা, 'এ'-বর্ণের বিবৃত ধ্বনি সংস্কৃতে নাই, সুতরাং উক্ত ধ্বনি-প্রকাশক কোন বর্ণও সংস্কৃত বর্ণমালায় নাই। বাংলায় ধ্বনিটি আছে, কিন্তু ধ্বনি-প্রকাশক কোন বর্ণ বা যোজ্য চিহ্ন অদ্যাবধি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। বাংলায় সংস্কৃতের মূল উচ্চারণও সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। সংস্কৃত 'এক' (Eka) শব্দের 'এ'-ধ্বনি বাংলায় বিকৃত হইয়াছে (Ak)। 'ত্যাগ' শব্দের ত্যা সংস্কৃতে যেভাবে উচ্চারিত হয় বাংলায় সেভাবে উচ্চারিত হয় না—বাংলা উচ্চারণ অনেকটা বিবৃত 'এ' ধ্বনির মতো। সংস্কৃত 'ব্যাস', বাংলা 'ব্যাঙ', ইংরেজী 'ব্যাট'—বাংলায় তিনটি শব্দেরই ব্যা উচ্চারণে একই স্বরধ্বনি। ব্যাস শব্দে ব-এ য-ফলা আ-কার আছে। সুতরাং মনে হয় ব্যাঙ শব্দেও ব-এ য-ফলা আ-কার। এটা যে য-ফলা আ-কার নয় তাহার প্রমাণ অভিধান খুলিলেই পাওয়া যাইবে। অভিধানে দুই বানানই আছে—বেঙ, ব্যাঙ। ব্যাঙ শব্দের Beng উচ্চারণ কোথাও নাই, তথাপি যে 'বেঙ' বানান দেওয়া হইয়াছে উহাতে ে-কারের বিবৃত ধ্বনিই বুঝিতে হইবে। অভিধানে দেখা যাইবে এই জাতীয় বহু অতৎসম শব্দে ে-চিহ্ন ্যা-চিহ্ন দুইটাই দেওয়া আছে। এই বিকল্পের কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে—ে-চিহ্নের স্থলে ্যা-চিহ্ন গ্রহণ করা হইয়াছে উচ্চারণ স্পষ্ট করার খাতিরে। ইংরেজী শব্দের অ্যা-উচ্চারণ বুঝাইতে আজকাল ে-চিহ্ন বড় একটা ব্যবহৃত হয় না, পূর্বে হামেশা হইত। ফলে শব্দগুলির প্রায়ই উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটিত। আজিও অনেকে Tax শব্দকে টেক্স (Teksho) উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ্যা-চিহ্ন যতক্ষণ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকে ততক্ষণ ইহার স্বরূপ ধরা পড়ে না, সব সময়েই মনে হয় য-ফলা আ-কার। স্বরূপ ধরা পড়ে তখনই যখন 'এ'-বর্ণের বিবৃত ধ্বনি-প্রকাশক বিশুদ্ধ স্বরবর্ণের প্রয়োজন হয়। তখন কেহ লেখেন অ্যা, কেহ লেখেন এ্যা। যাঁহারা স্বরবর্ণের সঙ্গে

্যা-চিহ্ন যোগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন তাঁহারা এখনও লেখেন—একাউন্ট, এসিড, এ্যকোনাইট, এডমির‍্যাল, এড্‌ভোকেট, এফিডেভিট, এগ্রিকালচার, এলাউ, এলার্ম, এ্যালোপ্যাথি, এল্যুমিনিয়াম, এমেচার, এ্যমোনিয়া, এমিবা, এনিমিয়া, এণ্ড কোম্পানি, এনফেলিস, এরিস্টটল, এরোরুট, এ্যথেন্স, এটর্নি ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে চলন্তিকা-কার রাজশেখর বসুর মতামত নিশ্চয়ই গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হইবে। চলন্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে ১৯৩৩ সালের ৫ই জুলাই একখানি চিঠিতে রাজশেখর উপস্থিত প্রবন্ধ-লেখককে যাহা জানাইয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করি।—

> "Cat এর a র উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য একটি নূতন স্বরবর্ণ ও তাহার যোজ্য রূপ হইলে ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র দুজনেরই এই মত। আমি প্রস্তাব করিয়াছি—এ্র ৮ (act=এ্রক্ট্*, hat=হেট্)। রবীন্দ্রনাথ এই দুই চিহ্ন পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু নূতন বর্ণ যেমনই হউক, চালাইতে সময় লাগিবে। আমার মতে তত দিন 'অ্যা ্যা' চিহ্ন দ্বারা কাজ চলিতে পারে। 'অ্যা' বর্ণমালায় নাই; য-ফলা+আ-কার= cat এর a তুল্য নয়। দুইটিই কৃত্রিম, কিন্তু অনেকে প্রয়োগ করেন সেজন্য পরিচিত। হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে—hat=হৈট।
>
> "আমি 'এমন এত কেমন খেলা' ইত্যাদি শব্দে এ-কার বজায় রাখিতেই চাই, রবীন্দ্রনাথের ে চিহ্নও চাই না। শব্দের উচ্চারণ সর্ব্বত্র বানান-অনুযায়ী হইবে এমন দুরাশা করি না। কেবল বৈদেশিক শব্দে এবং বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকটি বাংলা

---

*এ্র টাইপটি মাপে একটু বড় হইয়াছে, টাইপটি আর-একটু ছোট হইবে।—গ্রন্থকার

শব্দে 'অ্যা ্যা' লিখিতে চাই, যথা, 'অ্যাক্ট্, ফ্যাশন, অ্যাঁ, ছ্যা'।"

অনুরূপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শান্তিনিকেতন হইতে এক চিঠিতে এই লেখককে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহারও অংশবিশেষ সুধীবর্গের গোচর করি।—

"যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্ব্বদাই লিখতে হচ্চে সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নূতন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক—আমাদের মনটা অত্যন্ত সাবেককেলে বলে শীঘ্র এর কোনো কিনারা হবে বলে বোধ হয় না।"

আজ রবীন্দ্রনাথ নাই, যোগেশচন্দ্র নাই, সুনীতিকুমারেরও বয়স হইয়া গিয়াছে—তবে এখনও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আছে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ আছে, আধ ডজনেরও অধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ নামেও একটি প্রতিষ্ঠান আছে—ইহাদের কাহারও কি কিছু করণীয় নাই?

রাজশেখর বসুর চিঠি

চলন্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ যখন যন্ত্রস্থ, অভিধানকার রাজশেখর বসু মহাশয়কে একখানি চিঠি দিয়েছিলাম। রাজশেখর বসু অনুগ্রহ করে সঙ্গে-সঙ্গেই তার জবাব দিয়েছিলেন।

চতুষ্কোণ-সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহে রাজশেখরের চিঠিখানি এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। চিঠিখানি পড়লেই এর বিষয়বস্তু বোঝা যাবে। আমার চিঠিতে কয়েকটি শব্দের বানান, অর্থ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, এবং অভিধানে দেওয়া হয় নি এমন কয়েকটি শব্দ ও বিষয়-সন্নিবেশের প্রার্থনা ছিল। বানান-সংস্কার সম্বন্ধে সবিনয়ে দু'একটি মন্তব্যও করেছিলাম। একটি মন্তব্য ছিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সংস্কার-প্রচেষ্টা হলে স্বৈরাচার সহজে দূরীভূত হতে পারে। আমার চিঠিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল 'বিকৃত এ'-ধ্বনি প্রকাশের জন্য অ্যা এবং ্যা-চিহ্ন বর্জন করে দুটি নূতন চিহ্ন প্রবর্তন করা। এ সম্বন্ধে রাজশেখরবাবু সবিস্তারেই আলোচনা করেছেন।

চতুষ্কোণ-সম্পাদক মহাশয় রাজশেখরবাবুর চিঠিখানি ছাপছেন দেখে আনন্দিত হয়েছি। এই সূত্রে যদি রাজশেখরবাবুর উদ্ভাবিত চিহ্নদুটি প্রচারলাভ করে এবং সাহিত্যিকেরা চিহ্নদুটি স্বীকার করে নেন, চতুষ্কোণ-পত্র বাংলাভাষার বর্ণ-সংস্কারে অগ্রণী হবে বলে মনে করি। চিহ্নদুটি রাজশেখরবাবুর চিঠির প্রতিলিপি-অংশে দ্রষ্টব্য।

চিঠির মধ্যে আর-একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজশেখর বলেছেন, 'চলিত ভাষা' ও 'কথ্য ভাষা' এক নয়। সাহিত্যিকেরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কিনা জানি না। এই মত স্বীকার করে নিলে বানানে অসাম্য বহুলাংশে কমে যাবে।

রাজশেখরের চিঠিতে 'শয়তা' ও 'হিবাচী' শব্দদুটির পরে

প্রশ্ন-চিহ্ন আছে। 'শয়তা' শব্দটির অর্থ জানি না। শব্দটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর রচনায় পাওয়া গেছে—উদ্ভিদ্-বিষয়ক কোন-কিছু হতে পারে। 'হিবাচী' শব্দটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আছে। 'ছেলের দল' কবিতায় আছে 'হিবাচীতে আগুন জ্বেলে শিখ্‌ছে ওরা কজ্জাকল'। স্কুলপাঠ্য পুস্তকে কবিতাটি থাকে এবং শব্দটির অর্থ নিয়ে শিক্ষকেরা বিব্রত হন। অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন—শব্দটি জাপানী, অর্থ 'অগ্ন্যাধার'। চিঠির অন্যান্য অংশ সহজেই বোধগম্য হবে।

৩০ বি সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৫ই জুলাই ১৯৩৩

সবিনয় নিবেদন

আপনার ১৬ই আষাঢ়ের চিঠি পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম। বানান সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার প্রশ্নের উত্তর যথাসাধ্য দিতেছি।—

চলন্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতেছে। প্রায় অর্দ্ধেক ছাপা হইয়া গিয়াছে, বাকী বোধ হয় পূজার পরেই শেষ হইবে। আপনি যে সকল ত্রুটি দেখাইবেন তাহার সকলগুলির আর শোধনের উপায় নাই।

বাংলা বানানের পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথে, যোগেশচন্দ্র, সুনীতিকুমার এবং আরও কয়েক জনের সঙ্গে আমি কথা কহিয়াছি। সমস্ত শব্দের বানান সম্বন্ধে কাহারও নির্দ্ধারিত মত নাই, তবে সকলেই স্বীকার করেন যে একটা ব্যবস্থা হওয়া খুব দরকার। কতকগুলি শব্দের বানান সম্বন্ধে ইঁহাদের নিজ নিজ মত আছে। কোনো কোনো বিষয়ে ইঁহারা একমত, কিন্তু মতভেদও বিস্তর আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় সহজেই বানান স্থিরীকৃত হইতে পারে ইহা আমারও বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ সেই

চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শেষ অবধি কিছু হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

চলন্তিকা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি বানানের পদ্ধতি নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার উপায় এই।—কতকগুলি বাংলা শব্দের একটা ফর্দ্দ তৈয়ার করি। প্রায় চল্লিশ জন সুশিক্ষিত প্রবীণ ও নবীন লেখকের সহিত একে একে দেখা করি। আমি ফর্দ্দ হইতে এক-একটি শব্দ পড়ি এবং শ্রোতাকে তাহা বানান করিতে বলি। প্রথমেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম—সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার না করিয়া যে বানান মনে আসিবে তৎক্ষণাৎ বলিতে হইবে। আমার উদ্দেশ্য—লেখকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নির্দ্ধারণ এবং যে বানান অধিকতম ভোট পায় তাহা অবলম্বন করিয়া বানানের সাধারণ সূত্র গঠন। এই পরীক্ষার ফলে অনেক বানানের সামঞ্জস্য পাইয়াছিলাম, যথা ই-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত শব্দের। কিন্তু কতকগুলি শব্দে, বিশেষতঃ যাহার মূল সংস্কৃত শব্দে ঊ বা ণ আছে, এত অসামঞ্জস্য দেখা গেল যে ভোট দ্বারা সূত্র নির্ণয় সম্ভব হইল না। অগত্যা রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্রের মত লইলাম। উভয়েই বাংলা শব্দে ঊ ণ যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে চান। আমি অভিধানে যে বানান দিয়াছি তাহার অধিকাংশই উল্লিখিত দুই উপায়ে নির্ণীত। অবশিষ্ট শব্দে আমার রুচিসঙ্গত বানানকে প্রাধান্য দিয়াছি। নূতন সংস্করণে কোনো কোনো শব্দের বানান বদলাইয়াছি। আপনি যে 'কোম্পানী' দেখিয়াছেন তাহা ভুল, 'কোম্পানি' হওয়া উচিত ছিল।

'জয়ন্তী'—২য় সংস্করণে দিয়াছি।

'অভিলাস, উর্দ্ধ' দি নাই, কারণ প্রয়োগ বিরল, সকল সংস্কৃত অভিধানে নাই। কিন্তু এখন মনে হইতেছে 'উর্দ্ধ' দেওয়া উচিত ছিল, বানান সরল করার পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য হইত।

'ওঁছা' দি নাই, ভোটে 'ওঁচা' দাঁড়াইয়াছে।

'অগ্নিদগ্ধা, শয়তা (?), হিবাচী (?)' দি নাই। সম্বরা অর্থে 'সম্ভার' শুনি নাই, বোধ হয় প্রাদেশিক।

'পুত্র' দিব। 'পুত্র' প্রয়োগসিদ্ধ কিন্তু ব্যাকরণসম্মত নয়।

'গোয়েন্দা'।—মূল অর্থ জানি না। বাংলা অর্থ দিয়াছি।

'কথ্য' অর্থে কথনীয় এবং যাহা কহা হয়। 'কথিত'—যাহা কহা হইয়াছে। অতএব 'কথিত ভাষা'র চেয়ে 'কথ্য ভাষা' ভাল মনে হয়।* কিন্তু 'চলিত ভাষা' কথ্য ভাষা নয়। 'সাধু' ও 'চলিত' দুইটিই লেখ্য বা লৈখিক ভাষা।

'পরীক্ষা প্রার্থনীয়'।— যেন ইংরেজীর নকল, trial solicited। এরূপ প্রয়োগ খুব চলিতেছে, কাজেই শিষ্ট না বলিয়া উপায় নাই।

Cat এর a র উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য একটি নূতন স্বরবর্ণ ও তাহার যোজ্য রূপ হইলে ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র দুজনেরই এই মত। আমি প্রস্তাব করিয়াছি—এ ৳ (act= এক্ট্, hat=হেট)। রবীন্দ্রনাথ এই দুই চিহ্ন পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু নূতন বর্ণ যেমনই হউক, চালাইতে সময় লাগিবে। আমার মতে তত দিন 'অ্যা ্যা' চিহ্ন দ্বারা কাজ চলিতে পারে। 'অ্যা' বর্ণমালায় নাই; য-ফলা+আ-কার= Cat এর a তুল্য নয়। দুইটিই কৃত্রিম, কিন্তু অনেকে প্রয়োগ করেন সেজন্য পরিচিত। হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে—hat=হৈট।

আমি 'এমন এত কেমন খেলা' ইত্যাদি শব্দে এ-কার বজায় রাখিতেই চাই, রবীন্দ্রনাথের ে চিহ্নও চাই না। শব্দের উচ্চারণ সর্ব্বত্র বানান-অনুযায়ী হইবে এমন দুরাশা করি না। কেবল বৈদেশিক শব্দে এবং বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকটি

*বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র রায় লিখতেন 'কথিত ভাষা'।—প্রবন্ধলেখক

(তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রতিলিপি)

'পরীক্ষা প্রার্থনীয়' ।— যেন ইংরেজীর নকল, trial solicited; এরূপ প্রয়োগ খুব চলিতেছে, কাজেই ভিন্ন না বলিয়া উপায় নাই;

— cat এর a র উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য একটি নূতন স্বরবর্ণ ও তাহার যোগ্য রূপ হইলে ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র দুজনেরই এই মত। আমি প্রস্তাব করিয়াছি — এ ৫ (act = এক্ট, hat = হেট)। রবীন্দ্রনাথ এই দুই চিহ্ন পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু নূতন বর্ণ যেমনই হউক, চালাইতে সময় লাগিবে। আমার মতে ততদিন 'অ্যা ্যা' চিহ্ন দ্বারা কাজ চলিতে পারে। 'অ্যা' বর্ণমালায় নাই; য-ফলা + আ-কার = cat এর a তুল্য নয়। দুইটিই কৃত্রিম, কিন্তু অনেকে প্রয়োগ করেন সেকারণ পরিচিত। বিলাতি এই উদ্দেশ্যে এ-কার চলিতেছে — hat = হেট।

আমি 'এমন এত কেমন খেলা' ইত্যাদি শব্দে এ-কার বজায় রাখিতেই চাই, রবীন্দ্রনাথের ৫ চিহ্নও চাই না। শব্দের উচ্চারণ সর্বত্র বানান-অনুযায়ী হইবে এমন দুরাশা করি না। কেবল বৈদেশিক শব্দে এবং বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকটি বাংলা শব্দে 'অ্যা ্যা' লিখিতে চাই, যথা, 'অ্যাক্ট, ফ্যাশন, অ্যাঁ, হ্যাঁ'।

ঙ ঞ ণ ন ।— ণ স্থানে ন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যুক্তাক্ষরের ণ অংশকে ইচ্ছামত ণ বা ন মনে করা যাইতে পারে। আমরা লিখি 'রুগ্ন, ভগ্ন', কিন্তু বানান — রুগ্‌ণ, ভগ্‌ন।

বাংলা শব্দের 'ষত্ব' ণত্ব ও সন্ধির বিধি দেওয়ার সময় এখনও আসে নাই। যদি ইউনিভার্সিটি বা রবীন্দ্রনাথাদি পণ্ডিতগণ বানান-পদ্ধতি স্থির করেন তবেই সূত্র রচনা সম্ভব হইবে।

বাংলা শব্দে 'অ্যা ্যা' লিখিতে চাই, যথা, 'অ্যাক্ট্, ফ্যাশন, অ্যাঁ, ছ্যা'।

ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ।—ণ স্থানে ন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যুক্তাক্ষরের ৭ অংশকে ইচ্ছামত ণ বা ন মনে করা যাইতে পারে। আমরা লিখি 'রুগ্ন, ভগ্ন', কিন্তু বানান—রুগ্‌ণ, ভগ্‌ন।

বাংলা শব্দের 'ণত্ব' ণত্ব ও সন্ধির বিধি দেওয়ার সময় এখনও আসে নাই। যদি ইউনিভার্সিটি বা রবীন্দ্রনাথাদি পণ্ডিতগণ বানান-পদ্ধতি স্থির করেন তবেই সূত্র রচনা সম্ভব হইবে।

আপনি চলন্তিকার জন্য যে নোট লিখিয়াছিলেন তাহা যদি খুঁজিয়া পান অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। যদি কলিকাতায় আসেন তবে দেখা হইলে আনন্দিত হইব।

বিনীত

শ্রীরাজশেখর বসু

ব্যাকরণ-জিজ্ঞাসা

নির্দেশক সঙ্কেত

ভাষায় নানা প্রণালীতে সামান্যকে নির্দিষ্ট করা হয়। যে-পদকে ব্যাকরণে বিশেষণ আখ্যা দেওয়া হয় তাহার কাজ হইতেছে বিশেষ্য বা অন্য কোন পদকে বিশেষিত করা, অর্থাৎ বিশেষ্য বা অন্য কোন পদের অর্থকে বিশেষভাবে নির্দেশ করা। ব্যাপককে সঙ্কীর্ণ করা বা সামান্যকে নির্দিষ্ট করাই বিশেষণের ধর্ম। 'ছেলে' একটি সামান্য বিশেষ্য। 'ভাল ছেলে' বলিলে 'ছেলে' শব্দের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়, শব্দটির ব্যাপকতা কমে, অর্থাৎ শব্দটি কিয়ৎ-পরিমাণে নির্দিষ্ট হয়। বিশেষণের প্রকৃতি-অনুযায়ী বিশেষ্য আংশিকভাবে বা পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট হয়; যেমন 'এই ছেলে' 'সেই ছেলে' বলিলে 'ছেলে' শব্দ সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু কেবল বিশেষণ-প্রয়োগে নহে, অন্যান্য সঙ্কেত-সাহায্যেও বাংলা ভাষায় সামান্য বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করিয়া তোলা হয়। 'ছেলেটি' বলিলেও 'ছেলে' শব্দ নির্দিষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে 'টি' এই নির্দেশক সঙ্কেতটি ব্যাপককে সঙ্কীর্ণ করিয়া বিশেষণ পদেরই কাজ করিতেছে। কিন্তু 'টি'-কে ব্যাকরণে 'পদ', এমনকি 'শব্দ' বলিয়াও স্বীকার করা হয় নাই। কারণ ইহা বাক্যমধ্যে স্বতন্ত্রভাবে প্রযুক্ত হয় না এবং ইহার কোন অর্থও নাই। ইহা একটি চিহ্ন-বিশেষ—পদের অন্তে যুক্ত হইয়া পদের সামান্য অর্থকে বিশেষ অর্থে পরিণত করে। 'টি' স্বয়ংসম্পূর্ণ শব্দ নহে এবং ইহার স্থান পদের অন্তে—বোধ হয় এইটুকু লক্ষণ দেখিয়াই বৈয়াকরণগণ ইহাকে 'প্রত্যয়'-পর্যায়ে ফেলিয়াছেন, এবং সামান্যকে নির্দিষ্ট করে বলিয়া ইহার নাম দিয়াছেন 'নির্দেশক প্রত্যয়'।

একমাত্র 'টি'-ই এই শ্রেণীর চিহ্ন নহে। 'টা, টু, টুক, টুকু, টুকুন, টুকুনি, খান, খানা, খানি, গাছ, গাছা, গাছি' চিহ্নগুলিও 'টি' চিহ্নের

তুল্য। ইহারাও পদান্তে থাকিয়া পদকে নির্দিষ্ট করে। অতএব ইহাদেরও বলা হইয়াছে নির্দেশক প্রত্যয়। কিন্তু বৈয়াকরণেরা এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই। 'নির্দেশক' থাকিলেই 'অনির্দেশক'-এর প্রশ্ন আসে। অতএব 'গোটা, জন, এক' প্রভৃতি শব্দও এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'এক' শব্দকে অনেকেই প্রত্যয় বলিয়াছেন। কেহ কেহ 'জন' শব্দকেও প্রত্যয় মনে করিয়াছেন, কেহ কেহ 'গোটা' শব্দকেও প্রত্যয় বলিতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। এই শব্দগুলির সকলই 'প্রত্যয়'-বাচ্য কিনা, কিংবা ইহাদের একটাকেও 'প্রত্যয়' বলা চলে কিনা তাহাই প্রবন্ধলেখকের জিজ্ঞাসা।

প্রত্যয় কাহাকে বলে? কোন শব্দ, শব্দবিকৃতি, শব্দাংশ, কিংবা বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি পদান্তে থাকিয়া কোন বিশেষ অর্থ দ্যোতনা করিলেই কি উহারা বা উহাদের কোন একটি 'প্রত্যয়' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়? যদি তাহাই হয় তবে আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যয়ের অন্যতম কার্য যদি হয় শব্দ-গঠন বা শব্দান্তর-সাধন, তবে উক্ত শব্দ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলা চলে কিনা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

'দশরথ' শব্দের উত্তর ই বা ষ্ণি প্রত্যয়-যোগে সাধিত হয় 'দাশরথি' শব্দ। দশরথ এবং দাশরথি এক কথা নহে। ইহারা ভিন্ন অর্থ-যুক্ত ভিন্ন শব্দ। ই প্রত্যয় বর্জন করিলে 'দাশরথি'র অস্তিত্বই থাকে না। 'মাস্টার' শব্দের উত্তর 'ই' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ 'মাস্টারি'। মাস্টার ও মাস্টারি ভিন্ন গোত্রের শব্দ। 'মাস্টারি'র 'ই' চলিয়া গেলে 'মাস্টার' থাকেন বটে তবে তাঁহার কার্য থাকে না। 'প্রত্যয় শব্দের অন্যতম অঙ্গ' একথা বলিলেও প্রত্যয়ের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। দেহ হইতে অঙ্গবিশেষ ছিন্ন হইয়া গেলেও দেহ বিনষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু শব্দ হইতে প্রত্যয় সরিয়া গেলে শব্দটিই বিনষ্ট হয়। প্রত্যয় শব্দদেহের অবিচ্ছেদ্য অপরিহার্য উপাদান।

প্রত্যয়ান্ত যে-কোন সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ বিশ্লেষণ করিলেই দেখা

যাইবে, প্রত্যয়ের ধর্ম হইতেছে শব্দান্তর সাধন করা (ধাতুর ক্ষেত্রে শব্দ গঠন করা) অর্থাৎ ভিন্নজাতীয় শব্দ সৃষ্টি করা। 'টি' যদি প্রত্যয় হয়, তাহা হইলে 'টি'-ও যে-শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হইবে, সে-শব্দের গোত্র বদলাইবে। 'ছেলে' শব্দের উত্তর 'টি' প্রযুক্ত হইয়া নূতন শব্দ হইয়াছে 'ছেলেটি'। কিন্তু 'ছেলে' ও 'ছেলেটি' কি ভিন্নগোত্রীয় শব্দ? 'ছেলেটি' শব্দের 'টি' কি উক্ত শব্দের অপরিহার্য উপাদান?

'ভিন্ন গোত্র' কথাটির তাৎপর্য অনুধাবন করা দরকার। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রত্যয়ের কাজ শব্দ গঠন করা। এক-একটি প্রত্যয় এক-এক শ্রেণীর শব্দ গঠন করে। কোন শব্দই সবরকম প্রত্যয় গ্রহণ করে না, কিংবা কোন প্রত্যয়ই সবরকম শব্দের সহিত যুক্ত হয় না। 'দশরথ' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ্য, ষ্ণায়ন, ষ্ণিক, ইতচ্, ইলচ্, ইন্, বিন্, মতুপ্, ইমন্, তল্, তসিল্, চশস্, ঈয়স্, ইষ্ঠ, র, ধা, শ, ত্র' প্রভৃতি প্রত্যয় যেমন যুক্ত হইতে পারে না, তেমনই এরূপ কোন প্রত্যয় নাই যাহাকে যে-কোন শব্দের অন্তে প্রয়োগ করিয়া নূতন শব্দ গঠন করা যাইতে পারে। এক-একটি প্রত্যয় এক-এক বিশেষ শ্রেণীর শব্দ বাছিয়া লয়, এবং সেই শব্দের রূপগত, অর্থগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য সাধন করে। ধরা যাক, বাংলা ই প্রত্যয়। বাংলা প্রত্যয়ের মধ্যে এই প্রত্যয়টির পরিধি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, কিন্তু ইহারও প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। পণ্ডিতি হয়, শিক্ষকি হয় না; মুন্সেফি হয়, জজি হয় না; মোক্তারি হয়, উকিলি হয় না; সেলামি প্রণামি দর্শনি হয়, আদাবি অভিবাদনি শ্রবণি হয় না; বেগুনি বাদামি হয়, আমি জামি (আম+ই, জাম+ই) হয় না; আকাশি (রঙ) হয়, গগনি হয় না; কাল> কালি কিন্তু লাল> লালি নহে; মিষ্ট>মিষ্টি কিন্তু তিক্ত>তিক্তি নহে; পিত্ত>পিত্তি কিন্তু কফ>কফি নহে বা বিত্ত>বিত্তি নহে; কাঠ>কাঠি (ক্ষুদ্রার্থে) কিন্তু মাঠ>মাঠি বা ইঁট>ইঁটি নহে; পাঁচই সাতই দশই তারিখ কিন্তু একই তিনই চারই তারিখ নহে। সেজন্য একথা বলা হইতেছে না যে যেসমস্ত শব্দের উত্তর ই-প্রত্যয় বিহিত নয়,

সেসমস্ত শব্দের অন্তে ই-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই 'শিক্ষকই' ছাত্রপ্রিয়—তদ্রূপ জজই, উকিলই, আদাবই, অভিবাদনই, শ্রবণই, আমই, জামই, গগনই, লালই, তিক্তই, কফই, বিত্তই, মাঠই, ইঁটই, একই, তিনই, চারই প্রয়োগে কোন বাধা নাই। বস্তুতঃ ভাষার যাবতীয় শব্দের অন্তেই ই-শব্দ প্রযোজ্য। এই 'ই' শব্দান্তে থাকে, বিশিষ্ট অর্থও প্রকাশ করে, তথাপি ইহাকে প্রত্যয় বলা চলে না, কারণ ইহা শব্দান্তর সাধন করে না অর্থাৎ নূতন শব্দ গঠন করে না। ইহা একটি বহিরাগত শব্দ—পদপরিচয়ে ইহাকে বলা হইয়াছে 'অব্যয়'।

নির্দেশক চিহ্ন ভাষার যাবতীয় বিশেষ্য, বিশেষণ পদের অন্তে তো যুক্ত হয়ই, ইদানীং ক্রিয়াপদের অন্তেও যুক্ত হইতেছে—

কলমটা, দোয়াতটা।

কালিটা, জলটা, মাটিটা, বালিটা।

আকাশটা, বাতাসটা, আলোটা, দিনটা।

বুদ্ধিটা, বোকামিটা, সাহসটা, তেজটা।

হাসিটা, কান্নাটা, চলনটা, শয়নটা।

সঙ্ঘটা, সভাটা।

সুশীলটা, অতুলটা (সুশীলটা নামেই সুশীল, অতুলটার জ্বালায় অস্থির, দুটোই দুরন্ত ছেলে)।

একটা, দুইটা, তিনটা।

প্রথমটা, দ্বিতীয়টা।

এইটা, সেইটা।

তোমারটা, আমারটা, রামেরটা, শ্যামেরটা।

ভালটা, মন্দটা, লালটা, নীলটা।

দেখবেটা কী? করছটা কী? হ'লটা কী? যাবেটা কোথায়? বসবটা কোথায়? পড়বেটা কে? হাসবেটা কে?

দেখা যাইতেছে—প্রত্যয় যেরূপ এক-একটা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর শব্দ সৃষ্টি করে, এই চিহ্নটি তাহা করে না। 'টি, টা'কে প্রত্যয়

বলিতে ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় আপত্তি। 'ল্যাঙটা, ঝাপটা, চিমটা, চিমটি' শব্দসমূহে 'টা, টি' প্রত্যয়, কারণ ইহারা শব্দসমূহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; কিন্তু উদাহৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, এমনকি ক্রিয়াপদেরও অন্তে প্রযুক্ত 'টা'কে (কিংবা অন্যান্য নির্দেশক চিহ্ন থাকিলে তাহাদের) 'প্রত্যয়' বলা উচিত হয় না, কারণ উহারা যাবতীয় শব্দকেই এক কুক্ষির অন্তর্গত করে। উহারা যে শব্দের অপরিহার্য উপাদান নহে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে তাহা সহজে বোঝা যাইবে—

'এক গাছে এক ভূত ছিল; একটা গাছে এক ভূত ছিল; এক গাছে একটা ভূত ছিল; একটা গাছে একটা ভূত ছিল।'

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেও বাক্যচারিটির মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না; অর্থাৎ টা-যুক্ত ও টা-মুক্ত 'এক' শব্দে কোন অর্থ-বৈলক্ষণ্য নাই। ইহাকে প্রত্যয় নামে অভিহিত করিতে হইলে প্রত্যয়টির পরিচয় হইবে 'স্বার্থে টা' অর্থাৎ অন্য কোন অর্থ নাই এমন 'টা'।

আমাদের ধারণা—'টি, টা' নির্দেশক প্রত্যয় নহে, নির্দেশক সঙ্কেত। অন্য উপায়েও যেমন সামান্য শব্দকে নির্দিষ্ট শব্দে পরিণত করা হয়, 'টি, টা' প্রভৃতি চিহ্নকে পদান্তে যুক্ত করিয়াও তেমনই সামান্য শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়। নির্দেশ করে বলিয়া চিহ্নগুলিকে বলা হইয়াছে 'নির্দেশক'। 'নির্দেশক' নামটি দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বভাবসৌজন্যে তিনি এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

> "এই প্রবন্ধে নির্দেশক নামক একটি নূতন পারিভাষিক ব্যবহার করিয়াছি। পাঠকদের প্রতি আমার নিবেদন, এইরূপ নামকরণ অভাবে ঠেকিয়া দায়ে পড়িয়া করিতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধে আমার কোনো মমতা বা অভিমান নাই।"
>
> (শব্দতত্ত্ব, ১৩১৮)

রবীন্দ্রনাথ 'অভাবে ঠেকিয়া দায়েপড়িয়া' যে-'পারিভাষিক' ব্যবহার করিয়াছেন, বৈয়াকরণগণ তাহাই প্রসন্নমনে গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা

নির্দেশক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, কোথাও নির্দেশক 'প্রত্যয়' বলেন নাই। 'নির্দেশক, নির্দেশক চিহ্ন, নির্দেশক সঙ্কেত, নির্দেশক শব্দ, নির্দেশক পদ (যথা : এই,-সেই)'—এই কয়টি অভিধা ব্যবহার করিয়াই বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দতত্ত্বে তিনি বহু বাংলা প্রত্যয় আবিষ্কার করিয়া তাহাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে তিনি নির্দেশক চিহ্নগুলিকে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। 'টা' প্রত্যয় সম্বন্ধেও আলোচনা আছে, সেখানেও তিনি নির্দেশক 'টা'কে স্থান দেন নাই। 'চ্যাপটা, ল্যাঙটা, ঝাপটা, ল্যাপটা, চিমটা, শুকটা' আছে, কিন্তু 'লোকটা, একটা, দুইটা, সবটা, অনেকটা' নাই। 'টি' প্রত্যয়ের উদাহরণে 'চিমটি' আছে, 'একটি, দুটি, লোকটি' নাই। তবে বহুকাল পূর্বে, ১২৯৯ বঙ্গাব্দে, অন্য এক প্রসঙ্গে, উচ্চারণ বুঝাইতে, তিনি 'টা, টো, টে'কে 'বিভক্তি' বলিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধ ব্যতীত আর কোথাও তিনি ইহাদের 'বিভক্তি' বলেন নাই, যদিও ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি প্রবন্ধে ও গ্রন্থে স্বনির্দিষ্ট পরিভাষায় প্রত্যয়, বিভক্তি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা (ব্যাকরণ)' গ্রন্থে প্রত্যয় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন ; সচরাচর কোন ব্যাকরণ-গ্রন্থে পাওয়া যায় না এমন বহু প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছেন ; 'টা, টি' প্রত্যয়েরও 'স্বার্থে, সদৃশ অর্থে, সম্বন্ধীয় ও জাত অর্থে' এবং অন্যান্য নানা অর্থে বিবিধ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু নির্দেশক অর্থে 'টা, টি, খানা, খানি' প্রভৃতিকে ইহার মধ্যেও স্থান দেন নাই, প্রত্যয়-পরিচ্ছেদেরও অন্তর্ভূত করেন নাই। 'কারক ও সমাস' পরিচ্ছেদে 'সংখ্যা ও পরিমাণ-নির্দেশে' শীর্ষনাম দিয়া তিনি 'খান, খানা, খানি, টা, টি, টুক, টুকু, গোটা, গোটি, এক' প্রয়োগের বহুবিধ উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু কদাপি ইহাদের 'প্রত্যয়' নামে অভিহিত করেন নাই, কিংবা অন্য কোন নামও দেন নাই ; কেবল বলিয়াছেন, "নির্দিষ্ট করে, অনির্দিষ্ট করে"।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। নির্দেশক চিহ্ন প্রয়োগ-প্রসঙ্গে ব্যাকরণে গুরু-গম্ভীর ব্যাখ্যায় নিক্তির ওজনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, আদর-অনাদর, অনুকম্পা-বিরূপতার পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'ধ্বনিবিচার' প্রবন্ধে একটি মনোজ্ঞ দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। "পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নাকি কোন রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি রাজা-টি নও, রাজা-টা; আমিও পণ্ডিত-টি নই, পণ্ডিত-টা'।" দৃষ্টান্ত অনবদ্য। কিন্তু ভাষার প্রাত্যহিক ব্যবহারে এই পার্থক্য সর্বথা স্বীকৃত কিনা বিবেচনা করিলে মন্দ হয় না। 'মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি গেল, মনটা খারাপ হয়ে আছে; বাচ্চাটা কেঁদে কেঁদে সারা, একটু কোলে নেও; চক্ষুটাই যদি যায়, জীবনে সুখশান্তি কোথায়।'—নিশ্চয়ই মেয়ে, মন, বাচ্চা, চক্ষু সম্বন্ধে আদর-অনুকম্পার অভাব নাই। 'ভৃত্যটি একটি পয়লা নম্বরের চোর; ছেলেটি বড্ড জ্বালাচ্ছে; লোকটির ন্যাকামি দেখলে রাগ ধরে।'—'ভৃত্যটি' উল্লেখে কিঞ্চিৎ শ্লেষ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু 'একটি' প্রয়োগেও যদি শ্লেষ থাকে তো ব্যাকরণ মুখস্থ করিয়া কথাবার্তা কহিতে হয়। অনাদরে, অবজ্ঞায়ও 'ছেলেটি, লোকটি' ব্যবহার করা হয়। 'একটা পিঁপড়ের কামড়েই অস্থির; ভূগোলের প্রশ্নে একটি পর্বতের নাম চাওয়া হয়েছে।' ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে 'একটা' বলিতে কেহ লজ্জাবোধ করে না, কিংবা বৃহৎ পর্বতকেও 'একটি' বলিতে কেহ সন্ত্রস্ত হয় না। এইসমস্ত প্রয়োগ ব্যাকরণের সূত্র মানিয়া চলে না। আসল কথা—'টি, টা' প্রয়োগ বা অপ্রয়োগ, বক্তার ছন্দোবোধ ও ব্যক্তিগত রুচির উপরই নির্ভর করে বেশি। কিন্তু ইহারা যদি 'প্রত্যয়' হইত, নিয়মবন্ধন এতটা শিথিল হইতে পারিত না, বক্তার এতটা স্বাধীনতা থাকিত না।

'টি, টা'কে প্রত্যয় বলার তবু একটা হেতু আছে, ইহারা সর্বদাই শব্দান্তে থাকে। কিন্তু 'খান, গাছ' প্রভৃতি সর্বদাই শব্দান্তে থাকে না। 'খান দুই, খান তিন চার, গাছ দুই, গাছ তিন চার' প্রয়োগ সর্বত্র আছে। 'খান+এক+টা= খানিকটা' আমরা অহরহঃ ব্যবহার করি। 'গাছ+খান+এক=

গাছখানেক' প্রয়োগও বিরল নহে। তৎসত্ত্বেও যেহেতু ইহারা শব্দান্তে প্রযোজ্য, ইহাদের প্রত্যয় নাম দেওয়া হইয়াছে। অনিশ্চয়ার্থক 'এক' শব্দকেও প্রত্যয় বলা হইয়াছে। 'দুয়েক, তিনেক, শতেক, ক্ষণেক, দিনেক' প্রভৃতি শব্দের 'এক'-অংশকে প্রত্যয় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। অনিশ্চয়ার্থক 'এক' সঙ্কেত কেবল শব্দান্তেই থাকে না, শব্দের আদিতেও থাকে। 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' বাক্যের দুইটি 'এক'ই অনিশ্চয়ার্থক। কেবল বাংলায় নহে, সংস্কৃতেও 'এক' শব্দের অনিশ্চয়ার্থক প্রয়োগই বেশী। 'একদা' সংস্কৃত শব্দ। 'একো ব্যাঘ্রঃ' অর্থ 'কোন এক বাঘ'। সর্বনাম 'এক' শব্দের দ্বিবচন, বহুবচনও আছে। বহুবচনে 'এক' অর্থ 'কেহ কেহ'। এরূপ স্থলে 'এক'কে প্রত্যয় বলার সার্থকতা বোঝা যায় না। আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেন, "যে শব্দের অর্থ স্পষ্ট আছে এবং (যাহা) পৃথক্ প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাকে প্রত্যয় বলা চলে না।" আচার্যের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে 'এক' কখনও প্রত্যয় নহে।

ব্যাকরণে 'জন, গোটা' শব্দদ্বয়কেও প্রত্যয়মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ আরও অগ্রসর হইয়া 'থান' (পাঁচথান কাপড়), 'তা' (তিনতা কাগজ) এবং এই শ্রেণীর আরও কতিপয় শব্দকে প্রত্যয়-পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। এইসমস্ত শব্দ বিশেষণ পদের অন্তে যুক্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু কচিৎ বিশেষ্য পদের অন্তে যুক্ত হয়। ইহাদেরও যদি প্রত্যয় বলা হয়, বাংলা ভাষার বহু শব্দই প্রত্যয় হইয়া যাইবে। 'গোছা, গাদা, ছড়া, জোড়া, ঝাড়, দল' প্রভৃতি শব্দকেও অক্লেশে প্রত্যয় বলা যায়। ইহারা কেবল বিশেষণের নহে, বিশেষ্যেরও অন্তে প্রযুক্ত হয়। তিনগোছা উল, উলগোছা ; পাঁচগাদা খড়, খড়গাদা ; দশছড়া কলা, কলাছড়া ; একজোড়া ধুতি, ধুতিজোড়া ; চারঝাড় বাঁশ, বাঁশঝাড় ; দুইদল সৈন্য, সৈন্যদল'—প্রত্যয়ের চমৎকার উদাহরণ !

পূর্বেই দেখানো হইয়াছে—নির্দেশক সঙ্কেত ব্যতীতও সর্বদা পদান্তে যুক্ত হয় এমন শব্দ ভাষায় আরও আছে। "তুমিই যাবে ; সে যাবেই

ঠিক করেছে; কী কাণ্ডই করলে; কী বাঁদরামিই শিখেছ; কী শোভাই হয়েছে; যদিই বা অন্যায় করে থাকি। তুমিও যাবে; রাজাও চলেছে সন্ন্যাসীও চলেছে; সে এগোয়ও না পিছোয়ও না; তুমিও যেমন; হবেও বা; যদিও বা অন্যায় করে থাকি।"—দৃষ্টান্তগুলি সবই রবীন্দ্রনাথের এবং অব্যয়-প্রসঙ্গে রচিত। পদান্তে স্থিত এই 'ই, ও'কে স্বতন্ত্র অব্যয়পদ বলা হইয়াছে, প্রত্যয় বলা হয় নাই। অবশ্য 'ই, ও' প্রযুক্ত হয় শব্দে বিভক্তি-যোগের পরে, কিন্তু 'টি, টা' প্রযুক্ত হয় বিভক্তি-যোগের পূর্বে। এই কারণে হয়তো 'টি, টা'কে অব্যয় বলিতেও বাধা থাকিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের বলিয়াছেন 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য'।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার নির্দেশক চিহ্নের নাম দিয়াছিলেন 'পদাশ্রিত-নির্দেশক'। অধুনা এই নামটিও পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে-নামই দেওয়া হউক, 'টি টা'কে প্রত্যয় বলা সঙ্গত কিনা বৈয়াকরণদের আর-একবার চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

কর্মকর্তৃবাচ্য

সংস্কৃত ব্যাকরণে ক্রিয়ার একটি বাচ্যের নাম 'কর্মকর্তৃবাচ্য'। কর্ম নিজগুণেই স্বয়ং সিদ্ধ হইতেছে এইরূপ প্রতীতি হইলে ঐ কর্ম কর্তার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইজাতীয় কর্মকে বলা হয় 'কর্মকর্তা' :

ক্রিয়মাণন্তু যৎ কর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈগুর্ণৈঃ কর্তুঃ কর্মকর্তেতি তদ্ বিদুঃ॥

কর্মের কর্তৃত্বপ্রাপ্তি বুঝাইলে যে-বাচ্যের প্রয়োগ হয় তাহাকে বলে 'কর্মকর্তৃবাচ্য'।

পচতি ওদনং (পাচকঃ)—কর্তৃবাচ্য ;
পচ্যতে ওদনঃ (স্বয়মেব)—কর্মকর্তৃবাচ্য।

কর্তৃবাচ্যে 'পচতি' ক্রিয়ার কর্ম 'ওদনং', এবং কর্তাও পাওয়া যাইতেছে 'পাচকঃ'। কিন্তু কর্মকর্তৃবাচ্যে কে পাক করে তাহার সন্ধান নাই, আর 'ওদনং' 'ওদনঃ' হইয়া বসিয়াছে, অর্থাৎ কর্ম নিজেই কর্তা হইয়া নিজেই যেন পক্ক হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই বাচ্যে কর্মই যখন প্রধান, ক্রিয়াটি নিশ্চয়ই সকর্মক। অকর্মক ক্রিয়ার কর্ম থাকে না। তবে কর্মকর্তৃবাচ্যে সকর্মক ক্রিয়াটি অকর্মক হইয়া যায়।

ইংরেজী ভাষায়ও এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত আছে :—

Honey tastes sweet (is sweet when it is tasted).
The stone feels rough (is rough when it is felt).

ইংরেজী ব্যাকরণে এই শ্রেণীর voice-কে বলা হইয়াছে Quasi-Passive use of TRANSITIVE verbs.

A few TRANSITIVE verbs sometimes have a sort of passive sense with an active form.—Rowe & Webb.

এখানেও সকর্মক ক্রিয়া অকর্মক ক্রিয়ার মতো ব্যবহৃত হইতেছে।

অনুরূপ বাক্যবন্ধ বাংলাভাষায়ও আছে :—

সকল দুয়ার আপনি খুলিল।

কাপড় ছিঁড়িয়াছে।

বড় কষ্টে দিন কাটছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণেও এই শ্রেণীর বাক্য-বিন্যাসে ক্রিয়ার বাচ্যকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলা হইয়াছে। 'খুলিল, ছিঁড়িয়াছে, কাটছে' ক্রিয়াগুলি সকর্মক। কিন্তু ইহাদের কর্ম কোথায়? কর্ম হইতে পারিত 'দুয়ার, কাপড়, দিন' পদগুলি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এই পদগুলি কর্ম না হইয়া কর্তা হইয়া বসিয়াছে। দুয়ার যেন আপনি খুলিল, কাপড় যেন আপনি ছিঁড়িয়াছে, দিন যেন আপনি কাটছে। কর্ম কর্তা হইয়া 'স্বয়মেব প্রসিধ্যতি'—অতএব ইহারা কর্মকর্তৃবাচ্যই বটে। 'খুলিল, ছিঁড়িয়াছে, কাটছে' এই সকর্মক ক্রিয়াগুলি অকর্মক হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই 'স্বয়মেব' কথাটি বাংলা ব্যাকরণে কিছু গোল বাধাইয়াছে। ক্রিয়া সকর্মক কি অকর্মক বিবেচনা না করিয়া, কেবল 'স্বয়ং সিদ্ধ' দেখিয়াই বাংলা ব্যাকরণে কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ রচনা করা হইয়াছে। প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত বিদ্যালয়-পাঠ্য সুবিখ্যাত পাঁচখানি ব্যাকরণ-গ্রন্থ হইতে কর্মকর্তৃবাচ্যের কিছু কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করিতেছি—

(১) বৃষ্টি হয়। গাঁয়ে এখনও শাঁখ বাজে। ফল পাকিয়াছে।

(২) শাঁখ বাজে। বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে।

(৩) শঙ্খ বাজে। বিছানা গরম লাগে।

(৪) সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে শাঁখ বাজে। বিছানা গরম লাগে। জলে দেশ ভাসিয়া গেল। আম পাকে। ঝড়ে আম পড়ে।

(৫) আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির 'পরে। বাজিল সমররঙ্গে নবাবের ঢোল। ফল পাকিতেছে।

—এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যেসব ক্রিয়াপদ আছে তাহাদের একত্র করা যাক—'বাজে, হয়, পাকে, লাগে, ভাসে, পড়ে'।

ইহারা একটাও সকর্মক ক্রিয়া নহে। সুতরাং ইহাদের কাহারও 'কর্ম' থাকা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টান্তগুলি রচনা করা হইয়াছে কেবল 'স্বয়মেব প্রসিধ্যতি' কথাটা অবলম্বন করিয়া। কিন্তু বৈয়াকরণদের প্রণিধান করা উচিত ছিল যে বাচ্যের নাম 'কর্মকর্তৃবাচ্য'। শ্লোকেও বলা হইয়াছে 'ক্রিয়মাণন্তু যৎ কর্ম'। অতএব 'কর্ম' না থাকিলে কেবল 'স্বয়মেব প্রসিধ্যতি' কথাটার উপর জোর দেওয়া অর্থহীন। 'কর্ম' না থাকিলে 'কর্মকর্তা' হইবে কে? 'কর্মকর্তা' না থাকিলে 'কর্মকর্তৃবাচ্য' হইবে কিরূপে?

এই বৈয়াকরণেরা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, 'বাঁশী নিজে বাজে না, অপরে বাঁশী বাজায়'। আশ্চর্য! অপরে তো বাজে না, অপরে বাজায়। 'বাজে' আর 'বাজায়' কি একই কথা? শব্দদ্বয়ে অর্থগত পার্থক্য নাই? 'বাজ্' আর 'বাজা' কি একই শ্রেণীর ধাতু? 'বাজ্' সিদ্ধ ধাতু; 'বাজা' সাধিত ধাতু, প্রেরণার্থক ধাতু। প্রেরণার্থক ধাতুমাত্রই সকর্মক। যে-কোন অকর্মক ধাতুতেই আ-কার যোগ করিলে উহা প্রেরণার্থক হইবে এবং সকর্মক হইবে এবং তাহার অর্থও বদলাইয়া যাইবে। 'বাজা' ধাতু সকর্মক বলিয়া 'বাজ্' ধাতু সকর্মক নহে। কোন পদ 'বাজায়' ক্রিয়ার কর্ম হইলেই 'বাজে' ক্রিয়ারও কর্ম হয় না।

অকর্মক ক্রিয়া দিয়া 'কর্মকর্তৃবাচ্য' হইতে পারে না। 'বাজে, হয়, পাকে, লাগে, ভাসে, [আম] পড়ে' ক্রিয়াগুলি দিয়া যেসব উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, এগুলির একটাও কর্মকর্তৃবাচ্য নহে, সবই কর্তৃবাচ্য।

বাংলা বাক্যবিন্যাসে কর্মবাচ্য

একখানি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ-গ্রন্থে দেখিতেছি ক্রিয়ার বাচ্যপ্রসঙ্গে বলা হইতেছে—

"সাধারণতঃ অকর্মক ক্রিয়ারই ভাববাচ্যে প্রয়োগ হয়, তবে সকর্মক ক্রিয়ারও ভাববাচ্যে প্রয়োগ হইতে পারে।"

দৃষ্টান্তে দেখানো হইয়াছে—

(ক) ক'নে দেখা হইয়াছে —কর্মবাচ্য

(খ) ক'নে-দেখা হইয়াছে } —ভাববাচ্য

(গ) ক'নেকে দেখা হইয়াছে }

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, ক-চিহ্নিত বাক্যে 'দেখা হইয়াছে' এই যুক্তক্রিয়ার কর্মপদ "ক'নে" বাক্যে কর্তৃকারকের বিভক্তি পাইয়াছে অর্থাৎ তথাকথিত প্রথমা বিভক্ত্যন্ত পদ-রূপে স্থান পাইয়াছে বলিয়া ক্রিয়ার বাচ্যকে কর্মবাচ্য বলা হইয়াছে। খ-চিহ্নিত বাক্যে 'দেখা' পদকে বিশেষ্যরূপে "ক'নে" পদের সহিত সমাসবদ্ধ করিয়া 'হইয়াছে' ক্রিয়ার কর্তৃপদ করা হইয়াছে, কিংবা সমগ্র বাক্যটিকেই ক্রিয়াপদ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কর্মপ্রধান নহে কিংবা কর্মপদ আদৌ নাই বলিয়া এইপ্রকার বাক্যবিন্যাসাত্মক বাচ্যকে কর্মবাচ্য না বলিয়া ভাববাচ্য বলা হইয়াছে—বাক্যবিন্যাসে ক্রিয়ার ভাবই প্রধান হইয়াছে, অতএব সকর্মক ধাতু হইলেও বাচ্যটি ভাববাচ্য। গ-চিহ্নিত বাক্যে কর্মপদে কে-বিভক্তি থাকায় উহাকে কর্তৃ-বিভক্ত্যন্ত পদ অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তির পদ বলা চলে না, ক্রিয়াপদও কর্মনিষ্ঠ হইতে পারে না অর্থাৎ ক্রিয়াপদ কর্মপদের পুরুষ অনুসরণ করিতে পারে না, অতএব এইপ্রকার বাক্যবিন্যাসেও ক্রিয়ার বাচ্যকে কর্মবাচ্য না বলিয়া ভাববাচ্য বলা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাকরণে ক্রিয়া সকর্মক হইলেই কর্মপদের বিভক্তি লক্ষ্য না করিয়া এই শ্রেণীর বাক্যে ক্রিয়ার বাচ্যকে কর্মবাচ্য বলা হইয়া থাকে। প্রবীণ বৈয়াকরণদের গ্রন্থ হইতেই কর্মবাচ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি—

(১) আমাকে দেখা হয়। (২) আমায় দেখা হয়। (৩) রামকে বলা হয়। (৪) তাহাকে ডাকা হইবে। (৫) এমন দিনে তারে বলা যায়। (৬) বাঘটাকে আর দেখা গেল না। (৭) চোরটাকে ধরা গেল। (৮) ঝিকে মারিয়া বৌকে শাসন করা হয়।

দৃষ্টান্তগুলিতে কর্তৃপদের উল্লেখমাত্র নাই, তৎস্থলে প্রাধান্য পাইয়াছে কর্মপদ। কিন্তু কর্মপদ উদ্দেশ্যপদে পরিণত হয় নাই অর্থাৎ কর্মপদ অর্থে প্রাধান্য পাইলেও বাক্যগঠনে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ক্রিয়াপদ 'কে'-বিভক্তিযুক্ত কর্মপদের পুরুষ অনুসরণ করিতে পারে না। বাক্যগুলিতে ক্রিয়া সকর্মক এবং কর্তার প্রাধান্য নাই—মাত্র এই দুইটি ব্যতীত কর্মবাচ্য-সংজ্ঞার আর কোন লক্ষণই বিদ্যমান নাই। তৎসত্ত্বেও ইহাদের কর্মবাচ্য বলার একমাত্র কারণ বাক্যের গঠন অপেক্ষা বাক্যের ব্যঞ্জনাই বৈয়াকরণদের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু ব্যঞ্জনা যাহাই হউক, ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়ে কর্মপদ যদি প্রাধান্য না পায় অর্থাৎ কর্মপদ যদি ক্রিয়াপদকে নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহা হইলে বাচ্য আর যাহাই হউক, 'কর্মবাচ্য' আখ্যা পাইতে পারে না। সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা গ্রহণ করিব, অথচ সংজ্ঞার্থ গ্রহণ করিব না, এরূপ বিসদৃশ অবস্থায় সংজ্ঞার কোন মূল্য থাকে না। আমাদের বিশ্বাস, সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থের সামঞ্জস্য-বিধানের জন্যই প্রাগুক্ত ব্যাকরণ-গ্রন্থে একটা সংস্কার-প্রচেষ্টা হইয়াছে। এই সংস্কার-প্রচেষ্টায় ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে বাচ্যনির্ণয়ে বাক্যের ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করিতে হইবে বটে কিন্তু গঠনভঙ্গিকেও অবহেলা করা চলিবে না।

তবে সংস্কার যদি করিতেই হয়, মাঝপথে থামিয়া যাওয়া উচিত হয়

না, যতটা সম্ভব মূল সংজ্ঞার্থের দিকে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

"ক'নে দেখা হইয়াছে" বাক্যে "ক'নে"কে তথাকথিত প্রথমা বিভক্তির পদ মনে করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু "ক'নে" প্রকৃতপক্ষে প্রথমা বিভক্তির পদ নহে, দ্বিতীয়া বিভক্তিরই পদ। কর্তৃবাচ্যে আমরা বলি "ক'নে দেখেছি, ক'নে দেখতে যাব", কখনও বলি না "ক'নেকে দেখেছি, ক'নেকে দেখতে যাব"। "ক'নেকে" বলিলে অন্য অর্থ হয়, বিশেষ কোন একটি ক'নে সম্বন্ধে বলা হয়। "ক'নে দেখা হইয়াছে" আর "ক'নেকে দেখা হইয়াছে" এক কথা নহে। প্রথম বাক্যে এক বা একাধিক অনির্দিষ্ট ক'নে বুঝায়, দ্বিতীয় বাক্যে একটিমাত্র নির্দিষ্ট ক'নে বুঝায়।

"ক'নে দেখা হইয়াছে" বাক্যে "ক'নে" যে প্রথমা বিভক্তির পদ নহে, তাহা "ক'নে" শব্দের পরিবর্তে ব্যক্তিবাচক অন্য কোন শব্দ বসাইলেই ধরা পড়িবে। 'আমি, তুমি, তিনি, সে, যদু, যদুবাবু' প্রভৃতি পদ বসাইলে 'দেখা হইয়াছে' ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয় হয় না। 'আমাকে, তোমাকে, তাঁহাকে, তাহাকে, যদুকে, যদুবাবুকে' পদ বসাইলে বাক্যের যোগ্যতা নষ্ট হয় না। "ক'নে" শব্দের স্থলে 'সমুদ্র, পাহাড়, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, প্রভৃতি বস্তুবাচক বিশেষ্য বসাইলেও বাক্যের যোগ্যতাহানি হয় না, অর্থাৎ "ক'নে" এই বাক্যে বস্তুবাচক বিশেষ্যের কাজ করিতেছে। বস্তুবাচক বিশেষ্য কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি-যুক্ত হয় না। সুতরাং "ক'নেকে দেখা হইয়াছে" বাক্যে ক্রিয়ার বাচ্য ভাববাচ্য হইলে "ক'নে দেখা হইয়াছে" বাক্যেও ক্রিয়ার বাচ্য ভাববাচ্য।

প্রকৃতপক্ষে হ ধাতু-যুক্ত কোন বাংলা ক্রিয়ারই ব্যক্তিবাচক কর্মপদ কর্তৃকারকের বিভক্তি গ্রহণ করিতে পারে না। 'সে দেখা হইয়াছে, সে মারা হইয়াছে, সে জানা হইয়াছে, সে চেনা হইয়াছে, সে ডাকা হইয়াছে, সে বলা হইয়াছে, সে বাঁধা হইয়াছে, সে ধরা হইয়াছে,

সে কাটা হইয়াছে' বাংলা হয় না। কিন্তু কর্মপদ কর্মবিভক্তিযুক্ত অর্থাৎ তথাকথিত দ্বিতীয়া বিভক্তি-যুক্ত হইলে বাক্যগুলি অশুদ্ধ হয় না—'তাহাকে দেখা হইয়াছে, তাহাকে মারা হইয়াছে, তাহাকে জানা হইয়াছে, তাহাকে চেনা হইয়াছে, তাহাকে ডাকা হইয়াছে, তাহাকে বলা হইয়াছে, তাহাকে বাঁধা হইয়াছে, তাহাকে ধরা হইয়াছে, তাহাকে কাটা হইয়াছে'। আমাদের বক্তব্য—হ ধাতু-যোগে বাংলা ক্রিয়ার কর্মবাচ্য হয় না।

বাংলায় যা ধাতু, আছ্‌ ধাতু দিয়াও ক্রিয়ার কর্মবাচ্য-রূপ দেওয়া হয়। তবে এই দুইটি সহায়ক ক্রিয়ার প্রকৃতি কিছু ভিন্ন। ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মপদের পুরুষ অনুসরণ করে না, কিন্তু কখন কখন করে। 'সে দেখা যায়, সে জানা যায়, সে চেনা যায়, সে বকা যায়, সে ডাকা যায়, সে বলা যায়, সে ধরা যায়, সে ছাড়া যায়, সে টানা যায়' বাক্য হয় না, কিন্তু 'সে কাটা যায়' শুদ্ধ বাক্য। ব্যক্তি-বাচক 'সে' পদের সহিত 'দেখা আছে, জানা আছে, চেনা আছে, ডাকা আছে, বলা আছে, বোঝা আছে' প্রভৃতি বলা চলে না, কিন্তু 'সে কাটা আছে, সে বাঁধা আছে, সে ছাড়া আছে' প্রভৃতি বাক্য অর্থহীন নহে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার বাচ্য নির্ধারণ করা কঠিন।

বাংলা ক্রিয়ার সঙ্গে একমাত্র পড়্‌ ধাতু যোগ করিয়াই কর্মবাচ্যের রূপ দেওয়া যায়; যথা—সে ধরা পড়ে, সে বাঁধা পড়ে, সে কাটা পড়ে। তবে এই ধাতুটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ ক্রিয়ার সহিতই পড়্‌ ধাতুর যোগ হয় না।

বাচ্য হয় ক্রিয়ার, অর্থাৎ বাচ্য-নিরূপণে ক্রিয়ার রূপটিই লক্ষণীয়। সংস্কৃত কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার বিশিষ্ট রূপ আছে। ধাতুর সহিত 'য' যুক্ত করিয়া আত্মনেপদী রূপ দিলেই সংস্কৃত ক্রিয়ার কর্মবাচ্য-রূপ পাওয়া যায়। বাংলায় এইজাতীয় ক্রিয়ারূপ নাই। পণ্ডিতেরা অবশ্য বলেন, "সংস্কৃতের কর্মবাচ্যের 'যপ্রত্যয়' প্রাকৃতে 'ইজ্জ প্রত্যয়' রূপে পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক বাংলায় 'যা ধাতু'তে পরিণত হইয়াছে।" কিন্তু প্রত্যয়

যখন ধাতুতে পরিণত হইয়াছে তখন আমরা প্রত্যয়ের রূপটি দেখি না, ধাতুর রূপই দেখি। 'য প্রত্যয়'-এর কাজ 'যা ধাতু' দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রাকৃত 'ইজ্জই' বাংলায় শুধু 'যায়' হইয়া যায় নাই, সহায়ক যা ধাতু-রূপে 'যায়, যাইবে, গিয়াছে, গিয়াছিল, গেল' প্রভৃতি বিশিষ্ট ক্রিয়া-রূপ ধারণ করিয়াছে। সহায়ক ধাতু-রূপে হ, আছ্, পড়্ প্রভৃতি ধাতুরও যে-কাজ, যা ধাতুরও সেই কাজ, ইহার অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

সংস্কৃতে সমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে সকর্মক ধাতুর উত্তর ক্ত বা কৃত্য প্রত্যয় যোগ করিয়াও ক্রিয়ার কর্মবাচ্য পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ক্ত প্রত্যয় অতীত কালে ব্যবহৃত হয়, কৃত্য প্রত্যয় ঔচিত্যার্থে, অনুজ্ঞায় ও ভবিষ্যৎ কালে ব্যবহৃত হয়। সমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে বাংলায় এরূপ প্রয়োগ নাই তাহা নহে, তবে সচরাচর বাংলায় ক্রিয়ার কর্মবাচ্য পাইতে হইলে ক্ত প্রত্যয়ান্ত সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে বাংলা হ ধাতু যোগ করিয়া একপ্রকার যুক্তক্রিয়া গঠন করা হয়। বস্তুতঃ ইহাই বাংলায় ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের প্রচলিত রূপ। [পুস্তক] পঠিত হইল, পঠিত হইয়াছে, পঠিত হইতেছে, পঠিত হয়, পঠিত হইবে—সবগুলিই 'পঠিত-হ' ধাতুর নানা কালের রূপ। লক্ষ্য করিতে হইবে, সংস্কৃতে যে-প্রত্যয় ক্রিয়ারূপে সাধারণতঃ অতীত কালেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাংলায় তাহা হ ধাতুর সঙ্গে মিলিত হইয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেও প্রযুক্ত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে 'পঠিত' পদকে যুক্তক্রিয়ার অংশ মনে না করিয়া যদি বিশেষণ পদ মনে করা যায় এবং একমাত্র হ ধাতু-নিষ্পন্ন পদকেই ক্রিয়াপদ মনে করা যায়, তাহা হইলে 'পুস্তক পঠিত হয়'-কে কর্তৃবাচ্যে বাক্যবিন্যাস বলিতে বাধা হয় না। অকর্মক ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় হইলে সংস্কৃতে কর্তৃবাচ্য হয়। এমনকি সকর্মক গম্ ধাতু এবং উপসর্গযুক্ত (অর্থাৎ সকর্মক) শী, স্থা, আস্, বস্, শ্লিষ্, জন্, রুহ্, জৄ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় বিহিত। সংস্কৃতে ইহারা কর্তৃবাচ্য হইলে, আশা করি, বাংলায়ও ইহারা কর্তৃবাচ্য

হইবে। 'তিনি গত হইয়াছেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হইবেন, বানর বৃক্ষারূঢ় হইয়াছে' প্রভৃতিকে কর্তৃবাচ্যে বাক্যবিন্যাস বলিতে যদি বাধা না থাকে, 'তিনি প্রহৃত হইয়াছেন, প্রস্তাব গৃহীত হইল, আপনি দণ্ডিত হইবেন' প্রভৃতিকে কর্তৃবাচ্য বলিতে বাধা কোথায়?

ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদকে হ ধাতু হইতে ছিন্ন করিয়া যদি কেবল বিশেষণ পদ মনে করা সম্ভব হয় তাহা হইলে বাংলা আ প্রত্যয়ান্ত পদকেও হ, আছ্, পড়্ প্রভৃতি ধাতু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুদ্ধমাত্র বিশেষণ পদ মনে করা যাইতে পারে।

এইরূপ ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যবিন্যাসে ক্রিয়ার দুইটি মাত্র বাচ্য আছে মনে করিলে ব্যাকরণের জটিলতা কমে। ক্রিয়াপদ যদি সমস্ত পুরুষে বাচ্যান্তরিত কর্মপদের (অর্থাৎ কর্তৃকারকের বিভক্তিপ্রাপ্ত কর্মপদের) পুরুষ অনুসরণ করিতে পারে, বাচ্যটি হইবে কর্তৃবাচ্য; সমস্ত পুরুষে এবম্প্রকার কর্তৃপদের পুরুষ অনুসরণ করিতে না পারিলে বাচ্য হইবে ভাববাচ্য। 'আমি ধৃত হইয়াছি, তুমি ধৃত হইয়াছ, সে ধৃত হইয়াছে, আমি ধরা পড়িয়াছি, তুমি ধরা পড়িয়াছ, সে ধরা পড়িয়াছে'— কর্তৃবাচ্য। 'আমাকে ধরা হইয়াছে, চোরটাকে ধরা হইয়াছে, চোর ধরা হইয়াছে, মাছ ধরা হইয়াছে, মেয়েকে দেখা হইয়াছে, মেয়ে-দেখা হইয়াছে, মেয়ে দেখা হইয়াছে, মেয়ে দেখা গেল, মেয়ে দেখা আছে'— ভাববাচ্য।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'বিচারক-কর্তৃক অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছে' বাক্যে কর্তা কে? উত্তর হইবে, ইহা বাংলা বাক্যের প্রকৃতি নহে। কর্মবাচ্যের প্রয়োজনেই এককালে যে কৃত্রিম বাংলা সৃষ্ট হইয়াছিল অধুনা তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি যদি প্রশ্ন হয়, উত্তর হইবে— 'অপরাধী' কর্তৃকারক, 'বিচারক-কর্তৃক' ক্রিয়ার বিশেষণ, বাচ্যটি কর্তৃবাচ্য।

ব্যাকরণকূট

দুর্গং পথস্তৎ

কঠোপনিষদে আছে 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। পথঃ পদের বিশেষণ 'দুর্গং, তৎ' কেন? পথঃ পুংলিঙ্গ—পথিন্ শব্দের দ্বিতীয়া-বহুবচন, কিংবা পথ শব্দের প্রথমা-একবচন। কোন ক্ষেত্রেই 'দুর্গং, তৎ' ব্যাকরণসম্মত হয় না। পণ্ডিতদের কাছে সমাধান প্রার্থনা করি।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

বাক্যটির অর্থ কী? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানে বলেছেন 'জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গুরু'। অন্যান্য অভিধানেও এই অর্থ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র অর্থ করেছেন 'জননী জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গুরু'।

> ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী।"

কোন্ ব্যাখ্যা ঠিক? আমরা মনে করি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য। যাঁরা 'জননী এবং জন্মভূমি' অর্থ করেন তাঁরা একবচন 'গরীয়সী' বিশেষণকে উপেক্ষা করে, অব্যয় 'চ' পদের উপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু 'চ' অর্থ তো কেবল 'এবং' নয়, পাদপূরণেও 'চ' প্রযুক্ত হয়। 'চ পাদপূরণে পক্ষান্তরে হেতৌ বিনিশ্চয়ে'।

মূল শ্লোকটি কী?

চারটি শ্লোক পেয়েছি, যদিও আকর-গ্রন্থের সন্ধান পাই নি—

(১) ভূমের্গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥

(২) ন মে স্বর্ণময়ী লঙ্কা রোচতে তাত লক্ষ্মণ।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥

(৩) নেয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা রোচতে মে লক্ষ্মণ।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

(৪) ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা ন মহ্যং রোচতে সখে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

যাঁরা জানেন, সন্ধান দিলে অনুগৃহীত হব।

রুচিবান

ইদানীন্তন সাহিত্যে একটি নূতন শব্দ চোখে পড়ছে 'রুচিবান'। এখানেই শেষ হলে ভাবতাম একটি শব্দেই ব্যাকরণ-দোষ ঘটেছে। কিন্তু দিনের পর দিন পড়ে যাচ্ছি 'সমৃদ্ধিবান, সংস্কৃতিবান, কৃষ্টিবান'। অতএব ব্যাকরণে সূত্র খুঁজতে হল।

'ধনবান্, ভাগ্যবান্, পুণ্যবান্, মতিমান্ বুদ্ধিমান্, শ্রীমান্' প্রভৃতি শব্দ 'মতুপ্' প্রত্যয়-যোগের উদাহরণ। এসমস্ত শব্দের 'বান্ মান্'-এ হস্-চিহ্ন অত্যাবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যিকেরা হস্ বর্জন করেছেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে হস্ নিয়ে আলোচনা করছি না, কারণ অন্য প্রসঙ্গ গুরুতর।

'মতুপ্' প্রত্যয়টা কী, কোথায় কোন্ কাজে লাগে?

'তদস্যাস্মিন্ বাস্তি মতুপ্'—অর্থাৎ 'তৎ অস্য অস্তি, তৎ অস্মিন্ অস্তি' এই দুই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর মতুপ্ হয়। 'মতুপ্'-এর উ প্ ইৎ, মৎ থাকে; যথা—(তৎ অস্য অস্তি) শক্তিমান্, ধীমান্, অংশুমান্, পিতৃমান্, ধনুষ্মান্; (তৎ অস্মিন্ অস্তি) অগ্নিমান্, নদীমান্, বায়ুমান্, গোমতী (স্ত্রীলিঙ্গে)। এই হল সাধারণ সূত্র।

মতুপ্-এর ম-স্থলে ব হয়, এরূপ কয়েকটি সূত্রও আছে। প্রাসঙ্গিক সূত্র ক'টি এখানে তুলে দিচ্ছি। বলে রাখা ভাল, 'বতুপ্' বলে কোন প্রত্যয় নেই, স্থানবিশেষে মতুপ্-এর ম-স্থলে ব আদেশ হয়।

(১) অবর্ণান্তাদ্ বঃ :

অ-বর্ণান্ত (অ-বর্ণ=অ, আ) প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত

'মতুপ্'-এর ম-স্থানে. ব হয়; যথা—জ্ঞানবান্, বলবান্, বিদ্যাবান্, দয়াবান্।

(২) স্পর্শান্তাৎ :

যেসকল প্রাতিপদিকের অন্তে স্পর্শবর্ণ থাকে, তাদের উত্তর বিহিত 'মতুপ্'-এর ম-স্থানে ব হয়; যথা—তড়িত্বান্, বিদ্যুত্বান্, সম্পদ্বান্।

(৩) অবর্ণোপধাৎ :

যেসকল প্রাতিপদিকের উপধা-স্থানে অ-বর্ণ থাকে, তাদের উত্তর বিহিত 'মতুপ্'-এর ম-স্থানে ব হয়; যথা—ভাস্বান্, দ্বার্বান্।

(৪) মকারোপধাচ্চ :

যেসকল প্রাতিপদিকের উপধা-স্থানে ম থাকে, তাদের উত্তর বিহিত 'মতুপ্'-এর ম-স্থানে ব হয়; যথা—লক্ষ্মীবান্, শমীবান্।

অন্যান্য সূত্রের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ৪ নম্বর সূত্রটি ছাড়া ই-বর্ণের পর মতুপ্-এর ম-স্থানে ব হয় এমন তিনটিমাত্র শব্দ (বিশেষ অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ) ব্যাকরণকৌমুদীতে পাওয়া যায়—অষ্ঠীবান্, চক্রীবান্, কক্ষীবান্।

যাঁরা 'রুচিবান, সমৃদ্ধিবান, সংস্কৃতিবান' লিখছেন তাঁরা কী অর্থে কোন্ সূত্র-অনুয়ায়ী কোন্ প্রত্যয় প্রয়োগ করছেন জানতে চাই।

অপস্রিয়মাণ

আর-একটি নূতন শব্দ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে—'অপসৃয়মাণ' বা 'অপস্রিয়মাণ'। সৃ-ধাতু পরস্মৈপদী, 'অপ' উপসর্গ-যোগে সৃ-ধাতু আত্মনেপদী হয় আত্মনেপদ-বিধানে এমন কোন সূত্রের সন্ধান পাচ্ছি না। সুতরাং 'অপসৃয়মাণ' বা 'অপস্রিয়মাণ' স্বীকার করি কী করে?

প্রবহমান

বহ্ ধাতু উভয়পদী। অতএব 'বহমান' পদ শুদ্ধ। 'প্রবহমান' পদ স্বীকার করলে ণত্ব-বিধানানুযায়ী বানান হওয়া উচিত 'প্রবহমাণ'। হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত ব্যাকরণ-কৌমুদীতে 'কৃত্যচঃ' সূত্রে 'প্রবহমাণ' দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু পরস্মৈপদ-বিধানে 'প্রাদ্বহঃ' সূত্রে বলা

হয়েছে প্র-পূর্বক বহ্-ধাতুর পরস্মৈপদ হয় অর্থাৎ প্র-উপসর্গ ব্যবহার করলে শানচ্-প্রত্যয় চলে না। যাঁরা অশুদ্ধ প্রয়োগ করতে চান না, তাঁরা 'বহমান' কিংবা 'প্রবহৎ' লিখতে পারেন। তবে প্র-উপসর্গ এবং শানচ্-প্রত্যয় দুইয়ের প্রতিই যদি ঝোঁক থাকে অর্থাৎ গালভরা শব্দ না হলে রচনা অচল হয় তা হলে 'প্রবহমান' না লিখে 'প্রবহমাণ' লেখাই সঙ্গত। ডবল ভুল করে লাভ কী?

পৃথকীকৃত

বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা হস্ চিহ্ন ব্যবহারে কিছু অমনোযোগী। 'মতুপ্'-প্রত্যয়েও এঁরা হস্ প্রয়োগ করেন না—এঁরা লেখেন 'শক্তিমান, ভক্তিমান, ভগবান, বলবান'। 'সম্পদ্, বিপদ্, বাক্, বণিক্, পৃথক্' এঁদের লেখনীতে 'সম্পদ, বিপদ, বাক, বণিক, পৃথক'। ফলে সন্ধি-সমাসে, শব্দগঠনে নানা ভ্রমপ্রমাদ দেখা দিচ্ছে। একটি উদাহরণ 'পৃথকীকৃত' শব্দ। 'পৃথকীকরণ, পৃথকীকৃত' অভিধানেও স্থান পেয়েছে। যাঁরা এই ব্যবহার করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই মনে করছেন চ্বি-প্রত্যয় অবলম্বনে এই শব্দ গঠিত হচ্ছে। চ্বি-প্রত্যয়যোগের নিয়মাবলী অনুধাবন করলেই দেখা যাবে, 'পৃথক্' শব্দে চ্বি-প্রত্যয়যোগ চলে না।

চ্বি-প্রত্যয়টি কী সর্বাগ্রে তাই বোঝা যাক।

কৃভ্বস্তিযোগেঽভূততদ্ভাবে চ্বিঃ :

কৃ, ভূ ও অস্ ধাতুর অভূততদ্ভাব অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর চ্বি-প্রত্যয় হয়। চ্বি-প্রত্যয়ের সমুদয় ইৎ, কিছুই থাকে না। অভূততদ্ভাব মানে যার যে-রূপ ছিল না তার সে-রূপ হওয়া; যেমন যে বস্তু শুক্ল নয় তার শুক্ল হওয়া—অশুক্লঃ শুক্লো ভবতি= শুক্লীভবতি।

প্রাসঙ্গিক সূত্র ক'টি এখানে তুলে দিচ্ছি—

(১) দীর্ঘোঽন্ত্যঃ :

অভূততদ্ভাব অর্থে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়—লঘূকরণ, লঘূভবন।

(২) ঈষবর্ণস্য :

অভূততদ্ভাব অর্থে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত অ-বর্ণ স্থানে ঈ হয়—শুক্লীভবন, শুক্লীকরণ।

(৩) ঋতো রীঃ :

প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত ঋ-কারস্থানে রী হয়—শ্রোত্রীভবন, শ্রোত্রীকরণ।

মোটামুটি এই ক'টিই প্রধান সূত্র। দেখা যাচ্ছে চ্বি-প্রত্যয় প্রযুক্ত হচ্ছে সর্বত্রই স্বরান্ত শব্দে। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের জন্য অভূততদ্ভাব অর্থে একটিমাত্র সূত্র আছে—

অরুর্মনশ্চক্ষুশ্চেতোরহোরজসাং লোপশ্চ :

অভূততদ্ভাব-অর্থে অরুস্, মনস্, চক্ষুস্, চেতস্, রহস্, রজস্ শব্দের অন্ত্যবর্ণের লোপ হয়।

আর-একটি সূত্রে অধীনতা-অর্থেও চ্বি- প্রত্যয় হয়—

তদধীনবচনে :

রাজ্ঞোঽধীনং ভবতি=রাজীভবতি।

ব্যঞ্জনান্ত শব্দের জন্য চ্বি-প্রত্যয়যোগের আর কোন সূত্র নেই।

তা ছাড়া, যাঁরা 'পৃথকীকরণ' লেখেন তাঁরা আরও একটা কথা চিন্তা করতে পারেন। 'পৃথক্' শব্দের পর স্বরবর্ণ থাকলে সন্ধিতে ক্ 'গ্' হয়ে যায়। এদিকে নজর দিয়ে কেউ কেউ আবার 'পৃথগীকরণ' লেখেন, কিন্তু মূল নিয়ম ভুলে যান। উল্লিখিত কয়েকটি ব্যঞ্জনান্ত শব্দ ছাড়া স্বরান্ত শব্দ না হলে চ্বি-প্রত্যয়যোগ চলে না। আর প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত অ-বর্ণ স্থানেই ঈ হয়, হস্-যুক্ত ক-বর্ণ স্থানে নয়। 'পৃথকীকরণ, পৃথগীকরণ' কোন শব্দই ব্যকরণসম্মত নয়। শুদ্ধ শব্দ 'পৃথক্করণ' বা 'পৃথক্করণ', 'পৃথক্কৃত' বা 'পৃথক্‌কৃত'।

বলে রাখি, এ সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের শব্দানুশাসন বৈয়াকরণেরা সমর্থন করেন নি।

চলচ্ছক্তি

'চলচ্ছক্তি' শব্দটাও বাংলা ভাষায় খুব চলছে। শব্দটার মানে

করা হয় 'চলার শক্তি' অর্থাৎ 'চলনের শক্তি'। এই অর্থে সমাসবদ্ধ পদ আবশ্যক হলে বলা উচিত 'চলনশক্তি'। কারণ 'চলচ্ছক্তি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় 'চলৎ+শক্তি'। 'চলৎ' (চল্-ধাতু শতৃ-প্রত্যয়) শব্দের মানে 'যা চলে, যা চলছে, চলতে চলতে'—বাংলায় এককথায় 'চলন্ত'। 'চলচ্ছক্তি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'চলন্ত শক্তি, যে-শক্তি চলছে'। 'শক্তির চলা' আর 'চলার শক্তি' এক কথা নয়। 'চলচ্চিত্র' মানে 'যে চিত্র চলছে'—'চলনের চিত্র' নয়।

সংজ্ঞা দাও

বাংলা প্রশ্নপত্রে তথা বিদ্যালয়-পাঠ্য ব্যাকরণ-গ্রন্থগুলিতে 'সংজ্ঞা' শব্দটি ভুল অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। 'সংজ্ঞা' শব্দের অর্থ 'নাম, পরিভাষা'। 'সংজ্ঞা'-বাচক বিশেষ্য মানে 'নাম'-বাচক বিশেষ্য। 'অপিনিহিতি, বিপ্রকর্ষ, অপাদান কারক, অব্যয়ীভাব সমাস'—এসমস্ত হচ্ছে 'সংজ্ঞা' অর্থাৎ 'পরিভাষা'। সুতরাং 'অপিনিহিতির সংজ্ঞা দাও' বললে কোন অর্থ হয় না। বলা যেতে পারে 'অপিনিহিতির সংজ্ঞার্থ দাও' কিংবা 'অপিনিহিতি সংজ্ঞার ব্যাখ্যা দাও' কিংবা 'অপিনিহিতি' সংজ্ঞার লক্ষণ বলো'। ইংরেজী 'Definition' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'সংজ্ঞা' নয়, 'সংজ্ঞার্থ' বলা যেতে পারে। পরিভাষায়ও 'Definition'-কে 'সংজ্ঞার্থ' বলা হয়েছে, 'সংজ্ঞা' নয়। যে-কোন অভিধান খুললেই এটা জানা যাবে।

উদ্, উৎ

অধিকাংশ ব্যাকরণ-গ্রন্থে দেখতে পাই সংস্কৃতে কুড়িটি উপসর্গের একটি হচ্ছে 'উৎ'। কিন্তু পাণিনি-ব্যাকরণে 'উৎ' বলে কোন উপসর্গের উল্লেখ নেই, 'উদ্' আছে। 'উদ্' উপসর্গের সন্ধিগত আকৃতি স্থল-বিশেষে হয় 'উৎ'। পাণিনি-ব্যাকরণে অসন্ধিস্থলে 'উদ্' উপসর্গের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।

সন্ধিতে 'ক, খ, প, ফ, স' পরে থাকলে পদান্তস্থিত দ্-স্থানে ৎ হয়;

যথা—উদ্ + কর্ণ = উৎকর্ণ, উদ্ + খাত = উৎখাত, উদ্ + পীড়ন = উৎপীড়ন, উদ্ + ফুল্ল = উৎফুল্ল, উদ্ + সর্গ = উৎসর্গ।

উদ্ + অগ্র = উদগ্র ; তদ্বৎ উদাহরণ (আ), উদিত (ই), উদীয়মান (ঈ), উদ্গত (গ), উদ্ঘাটন (ঘ), উচ্চারণ (চ), উচ্ছেদ (ছ), উজ্জ্বল (জ), উড্ডীন (ড), উত্তপ্ত (ত), উত্থিত (থ—স্থ'র স্ লোপ), উদ্দীপ্ত (দ), উদ্ধব (ধ), উন্নীত (ন), উদ্বুদ্ধ (ব), উদ্ভব (ভ), উন্মত্ত (ম), উদ্যোগ (য), উদ্রিক্ত (র), উল্লঙ্ঘন (ল), উদ্বাহ (ব), উচ্ছৃঙ্খল (শ), উদ্ধৃত (হ)—এই শব্দগুলিতে যে-উপসর্গ আছে সেটা 'উৎ' নয়, 'উদ্'।

সর্বত্র না হলেও 'তদ্ তৎ, যদ্ যৎ' প্রভৃতি সন্ধির ক্ষেত্রেও প্রায়শঃ এইজাতীয় ভুল ব্যাকরণ-গ্রন্থগুলিতে দেখা যায়।

মহান্ নেত্রী, মহতী সমাবেশ

বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য-পদে পুংলিঙ্গ বিশেষণ-প্রয়োগ বহুকাল ধরে চলে আসছে। অবশ্য 'সরলা বালিকা' আমরা এখনও বলি, তবে 'বালিকাটি সরলা' আর বলি না, এখন বলি 'বালিকাটি সরল'। কিন্তু 'বুদ্ধিমান্ বালিকা' বা 'বালিকাটি বুদ্ধিমান্'—এই শ্রেণীর প্রয়োগ এখন পর্যন্ত শুরু হয় নি।

পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্য-পদে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ-পদ কিছুকাল ধরে শুরু হয়েছে বোধ হয় অনবধানতাবশতঃ। 'শতবার্ষিকী উৎসব', 'মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান' শিক্ষিতসমাজেও অবাধে চলে যাচ্ছে।

সেকালে 'Executive Committee'-র বাংলা করা হয়েছিল 'কার্যকরী সমিতি'। ক্রমে এসে গেল 'কার্যকরী সম্পাদক, কার্যকরী সভাপতি, কার্যকরী সিদ্ধান্ত, কার্যকরী প্রস্তাব, কার্যকরী উপায়'। সৌভাগ্যের বিষয় আজকাল কেউ কেউ লিখছেন 'শতবার্ষিক উৎসব, জন্মবার্ষিক উপহার'। 'কার্যকরী প্রস্তাব, কার্যকরী উপায়' না বলে এখন অনেকে বলেন 'কার্যকর প্রস্তাব, কার্যকর উপায়'। আনন্দের কথা। কিন্তু 'কার্যকরী ব্যবস্থা, কার্যকরী পদ্ধতি, কার্যকরী সংস্থা'-তে কিছু দোষ ছিল না। আকাশবাণীতে আজকাল প্রায়ই শুনি 'কার্যকর

ব্যবস্থা'। 'কার্যকরী' অনেক উৎপাত করেছে, প্রতিক্রিয়ায় 'কার্যকর' কিছু উগ্র হয়েই প্রতিশোধ নিচ্ছে।

কিছুকাল যাবৎ বেতারে কতবার যে 'আমাদের মহান্ নেত্রী' শুনেছি, তার সীমাসংখ্যা নেই। 'নেত্রী' যখন 'মহান্' হয়েছেন তখনই আশঙ্কা করেছি 'মহতী বিনষ্টিঃ' সম্মুখে! আমরা রাজনীতির কথা বলছি না, ভাষার কথাই বলছি। সম্প্রতি সরকারী শিক্ষাবিভাগের আনুকূল্যে প্রকাশিত একখানি স্মারকগ্রন্থে পেয়ে যাচ্ছি কোন এক বিশিষ্ট সাহিত্যিকের 'জন্মশতবার্ষিকী উৎসব' উপলক্ষ্যে এক 'মহতী সমাবেশে' উক্ত সাহিত্যিকের কর্ম ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনার সংবাদ।

এ কি বাংলা ভাষার 'মহান্ দুর্দশা', না 'মহতী সৌভাগ্য'?

তরুণদের উদ্দেশে

কতিপয় শব্দের বানান

গোরু, নোতুন

বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ-সকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার। উদ্দেশ্য—বানানসংস্কার-সম্বন্ধে উপদেশ-গ্রহণ। সুনীতিকুমারের সঙ্গী ছিলেন সংস্কার-সমিতির দুই সদস্য অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। সুনীতিকুমার প্রস্তাব করলেন, "কতকগুলো শব্দের মৌলিক রূপটা বজায় রাখবার জন্য চলতি বানান কিছু কিছু পরিবর্তন করতে চাইছি।" রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন "যথা?" সুনীতিকুমার বললেন, "যেমন গরু। আমার মনে হয় শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'গো-রূপ' থেকে, সুতরাং বানান 'গরু' না হয়ে 'গোরু' হলেই ভাল হয়।" কবি বললেন, "হাঁ, অন্ততঃ কলেবর-বৃদ্ধি হয়। গাইগুলো দিন দিন যা ক্ষীণ হয়ে পড়ছে, কলেবর বাড়ানো ভাল নিশ্চয়ই।"

সুনীতিকুমার তাঁর ব্যাকরণ- ও ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক বহু গ্রন্থের ভূমিকায় 'গোরু' বানানে ও-কার প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এ বিষয়ে মোটামুটি কৃতকার্যও হয়েছেন। আধুনিক লেখকেরা এই বানানটি প্রসন্নমনেই গ্রহণ করেছেন। সুনীতিকুমার আরও দুটি শব্দে ও-কার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন এবং এ সম্বন্ধেও অনেক লিখেছেন, কিন্তু তেমন সাড়া পান নি। একটি শব্দ হচ্ছে 'নোতুন', অন্যটি 'মুক্তা' থেকে 'মোতী'। এসম্বন্ধে ভাষাচার্য যে 'কৈফিয়ৎ' দিয়েছেন, তা তাঁর নিজের ভাষাতেই ব্যক্ত করি। 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থের 'বিজ্ঞপ্তি'তে সুনীতিকুমার বলছেন :

> "চলতি ভাষার একটী শব্দের বানান-সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ আবশ্যক হইয়াছে : 'নোতুন' শব্দ। সাধারণতঃ ইহাকে

'নতুন'-রূপে বানান করা হয়। এই শব্দটীর প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ হইতেছে : 'নৌতুন' : ঔ-কারযুক্ত এই রূপ হিন্দীতে এখনও প্রচলিত আছে। 'নৌতুন' হইতে আধুনিক বাঙ্গালা চলিত ভাষায় 'নোতুন' বা 'নতুন'—সংস্কৃত 'নূতন' শব্দের আধুনিক উচ্চারণ-বিকারে নহে। বাঙ্গালার প্রাকৃতজ ও অর্ধতৎসম শব্দের বানান-সম্বন্ধে ছাপার অক্ষরের প্রচলনের যুগ হইতেই বাঙ্গালী লেখকেরা একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়ায়, এইরূপ শব্দ-সম্বন্ধে বানান-বিষয়ে যথেচ্ছাচার চলিতে থাকে; এবং এইরূপ শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস বহু স্থলে জানা না থাকায়, খুশী-মত ব্যাখ্যা করিয়া ইহাদের উচ্চারণ এবং রূপ-ও বদলাইবার দিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা সজ্ঞান বা অজ্ঞান চেষ্টা দেখা যায়। বাঙ্গালা উচ্চারণের একটী বিশিষ্ট নিয়ম এই যে, পরবর্তী অক্ষরে 'ই' 'উ' বা য-ফলা থাকিলে, পূর্ববর্তী অক্ষরের অ-কারের উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায়। ভাষাতত্ত্বের সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে যেখানে ও-কার লেখা উচিত, তাহা না করিয়া এইরূপ শব্দ-সম্বন্ধে প্রাচীন রীতি বা ইতিহাসকে অবহেলা করিয়া, ও-কার না লিখিয়া, পরে 'ই' বা 'উ' থাকিলে, মাত্র অ-কার দ্বারাই বানানে এই ও-কারের ধ্বনি সূচিত করা হইতে থাকে। ফলে, 'নোতুন' স্থলে 'নতুন', 'গোরু' স্থলে 'গরু' (সংস্কৃত 'গো-রূপ'—প্রশংসার্থে বা স্বার্থে 'রূপ' শব্দ-যোগ, তাহা হইতে প্রাকৃতে 'গোরূবঁ, গোরূঅ', তাহা হইতে আধুনিক ভাষায় হিন্দীতে 'গোরূ', বাঙ্গালায় 'গোরু'), 'মোতী' বা 'মোতি' স্থলে 'মতি' (মুক্তা অর্থে—সংস্কৃত 'মৌক্তিক', তাহা হইতে প্রাকৃতে 'মোত্তিঅ', তাহা হইতে ভাষায় 'মোতী') ইত্যাদি বানানের উদ্ভব। শব্দের উৎপত্তি বিচার করিলে, ও-কার স্থলে অ-কার লেখা এইরূপ বানানকে অশুদ্ধই বলিতে হয়।"

ভাষাচার্যের এত-সব যুক্তির পর 'গোরু, নোতুন, মোতি (মোতী ?)' শব্দ-তিনটিতে ও-কার বসাতে, আশা করি, কারও আপত্তি হবে না। তবে 'মোতি' শব্দে দীর্ঘ-ঈকারের যথোপযুক্ত কারণ আছে বলে মনে করি না। ওটা সুনীতিকুমারের বিশেষ প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ এসব স্থলে দীর্ঘ-ঈকার চিন্তাই করতে পারেন না।

পৌরোহিত্য, ভৌগোলিক

আজকালকার 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'-এর নিমন্ত্রণ-পত্রে একটি চিরন্তন 'ও-কার' বিলুপ্ত হতে বসেছে। ইদানীং কালে সভা-সমিতিতে 'সভাপতি'র প্রয়োজন হয় না, সে-স্থানে আসেন এক 'পুরোহিত'। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির 'পৌরোহিত্যে' সভার কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু চিঠিপত্রে 'পৌরোহিত্য' ও-কার হারিয়ে 'পৌরহিত্য' হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানের কর্তারা মনে রাখবেন র'এর ও-কার পুরোহিতের চাদর নয়, ওটা তাঁর অঙ্গ (পুরস্ = পুরঃ + ধা ধাতু)। পূজামণ্ডপে অঙ্গহীন পুরোহিতের অর্চনা-আরতি কি ভক্তবৃন্দের ভাল লাগবে ?

এই প্রসঙ্গে ভূগোলের কোন কোন শিক্ষক ও গ্রন্থকারকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার 'ভৌগোলিক' শব্দের 'গো' থেকে ও-কার হরণ করলে ভূ আর গোল থাকে না। ও-কার বঞ্চিত হয়ে 'ভৌগোলিক' শব্দ 'ভৌগলিক' রূপে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতায় স্থান পেলে পরীক্ষকেরা গোল গোল নম্বর দিয়ে ও-কারের অভাব মিটিয়ে নেবেন। সাধু সাবধান !

সুধী, সুধীবর্গ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের আরও একটি বানান-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। 'সুধী' শব্দে বাংলায় সর্বদাই ধ'এ দীর্ঘ-ঈকার। সম্বোধনেও 'সুধী', 'সুধীবর্গ, সুধীগণ' প্রভৃতিতেও 'ধী'। বাংলায় কোন ক্ষেত্রেই 'সুধী' শব্দে হ্রস্ব-ইকার চলে না।

সহযোগী, সহযোগিতা

শুভানুধ্যায়ীদের 'সহযোগিতা' কামনা করলে গ'এ দীর্ঘ-ঈকার চলবে না, যদিও দীর্ঘ-ঈকারান্ত 'সহযোগী'ই 'সহযোগিতা' করেন। তেমনই 'প্রতিযোগী' করেন 'প্রতিযোগিতা'। 'সহযোগী, প্রতিযোগী' সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত শব্দ। ইন্-ভাগান্ত শব্দ বাংলায় দীর্ঘ-ঈকারান্ত শব্দ হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর শব্দে সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ করলে 'ইন্'-এর 'ন্' লোপ পায়, হ্রস্ব-ই'র পরে প্রত্যয়-যোগ হয়; যেমন—সহযোগী, সহযোগিতা ; প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতা ; উপযোগী, উপযোগিতা ; উপকারী, উপকারিতা ; অপকারী, অপকারিতা ; স্বেচ্ছাচারী, স্বেচ্ছাচারিতা ; উন্মার্গগামী, উন্মার্গগামিতা ; প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; বিলাসী, বিলাসিতা।

শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু

'আস্পদ' লিখতে 'স্প', কদাপি 'ষ্প' নয় ; সুতরাং শুদ্ধ বানান 'শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু'।

'শ্রদ্ধাস্পদ, স্নেহাস্পদ, শ্রদ্ধাভাজন, স্নেহভাজন' প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহারে আরও কিছু খট্‌কা আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'আস্পদ, ভাজন' শব্দদ্বয় অজহল্লিঙ্গ, অর্থাৎ এই দুটি শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্তন হয় না। সুতরাং '-আস্পদা, -ভাজনা, -আস্পদাসু, -ভাজনাসু' লিখলে ব্যাকরণ-দোষ ঘটে। 'শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, স্নেহাস্পদেষু, স্নেহভাজনেষু' প্রভৃতি শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করা যায় না।

প্রণত, প্রণতা

গুরুজনকে চিঠি লেখার সময়ে লেখক-লেখিকা অনেক সময়ে নিজ নিজ নামের পূর্বে 'প্রণত, প্রণতা' লেখেন। মনে রাখতে হবে এই শব্দদ্বয়ে বিসর্গের স্থান নেই। 'প্রণত, প্রণতা'র পরে বিসর্গ দিলে ভুল হবে।

'আপাত, প্রত্যুত, স্বগত, স্বর্গত, ক্রমাগত, ওতপ্রোত' কোন শব্দেই বিসর্গ নেই। তস্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দেই বিসর্গ থাকে, এদের একটাও তস্‌-প্রত্যয়ান্ত শব্দ নয়।

আকাঙ্ক্ষা

'ক্ষ' স্থলে 'খ' লেখার একটা ঝোঁক এসেছে আধুনিক লেখকদের মধ্যে। ফলে অনেক সময়ে হাস্যকর বানান দেখা যায়। 'আকাঙ্ক্ষা' লিখতে সর্বদা 'ক্ষ' ব্যবহার করতে হবে, কদাপি 'খ' নয়। আকাঙ্ক্ষা যদি বিশুদ্ধ না হয়, ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না।

অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, তীক্ষ্ণ

আর মনে রাখতে হবে 'অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, প্রাহ্ণ' শব্দগুলিতে হ্'এ মূর্ধন্য-ণ। র'এর পরে হ'এর সঙ্গে যুক্ত থাকে মূর্ধন্য-ণ এবং এই ণ'এর অবস্থান হ'এর নীচে। কিন্তু 'মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন'তে হ-এর সঙ্গে যুক্ত হয় দন্ত্য-ন, এই ন থাকে হ'এর পাশে। হ'এর নীচে সর্বদাই মূর্ধন্য-ণ বসাতে হবে, কিন্তু ছাপাখানায় ভুল টাইপ থাকে—অনেক সময়ে দেখা যায় হ'এর পাশে ন'এর চিহ্ন না দিয়ে দন্ত্য-ন'কে হ'এর নীচে বসানো হয়েছে। এই টাইপগুলিকে বর্জন করতে হবে।

এইরকম আরও একটা ভুল টাইপ ছাপাখানায় আছে। ক্ষ'র নীচে কখনও দন্ত্য-ন থাকতে পারে না, কারণ ক্ষ=ক্‌+ষ; ষ-এর পরে কদাপি দন্ত্য-ন থাকে না। ক্ষ'র সঙ্গে যুক্ত হবে মূর্ধন্য-ণ। 'তীক্ষ্ণ, লক্ষ্ণৌ' লিখতে ক্ষ'র সঙ্গে যুক্ত থাকবে মূর্ধন্য-ণ। যাঁরা প্রুফ সংশোধন করবেন, সর্বদা সাবধান থাকবেন হ বা ক্ষ'র নীচে কখনও যেন দন্ত্য-ন না থাকে।

বিদুষী, দুর্গা

'বিদ্বান্‌' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'বিদুষী'। 'বিদুষী' লিখতে দ'এ হ্রস্ব-উকার। দ'এ দীর্ঘ-উকার দিলে সাংঘাতিক ভুল হবে।

'দুর্গা' শব্দেও দ'এ হ্রস্ব-উকার। 'দুর্গা'র দ'এ দীর্ঘ-উকার দিলে 'দুর্গতি' অনিবার্য। 'দুর্গা'-ই 'দুর্গতি-নাশিনী' একথা যেন সর্বদা স্মরণ থাকে।

কালী, কালিদাস

'দুর্গা' পূজার পরে আসে 'লক্ষ্মী' পূজা। 'লক্ষ্মী' শব্দের ক্ষ'তে ম-ফলা চাই, আর চাই দীর্ঘ-ঈকার। তার পরেই 'কালী' পূজা। 'কালী'তেও দীর্ঘ-ঈকার।

'লক্ষ্মী, কালী, ভগবতী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, চণ্ডী, গৌরী, ষষ্ঠী' এই সব 'দেবী'ই দীর্ঘ-ঈকারান্ত।

'কালীমাতা'-প্রসঙ্গে 'কালী'র ল'এ একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্র দীর্ঘ-ঈকার।

মহাকালী, উগ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, সিদ্ধকালী, জয়কালী, মায় আন্নাকালী (আর+না কালী)।

কালীমূর্তি, কালীমন্দির, কালীপট, কালীপীঠ, কালীক্ষেত্র, কালীতলা, কালীঘাট, কালীভক্তি, কালীসেবা, কালীস্তব, কালীস্তোত্র, কালী-আরাধনা।

কিন্তু একটি ব্যতিক্রম—'দাস' শব্দ পরে থাকলে বানান হবে 'কালিদাস'। কবি কালিদাস। কালিদাস রায়, কালিদাস নাগ, কালিদাস ভট্টাচার্য।

অনুরূপ শব্দ 'দেবিদাস, ষষ্ঠিদাস'।

'দাস' শব্দ পরে থাকলেই 'কালী, দেবী, ষষ্ঠী' শব্দকয়টিতে হ্রস্ব-ইকারের বিধি—নচেৎ সর্বদা দীর্ঘ-ঈকার। কালীকিঙ্কর, কালীপদ, কালীচরণ, কালীপ্রসাদ, কালীপ্রসন্ন, কালীধন, কালীনাথ; দেবীপদ, দেবীপ্রসাদ, দেবীপ্রসন্ন; ষষ্ঠীচরণ, ষষ্ঠীপদ, ষষ্ঠীপ্রসাদ।

'চণ্ডীদাস, চণ্ডিদাস' দুই-ই শুদ্ধ। কিন্তু 'দাস' পরে না থাকলে চণ্ডীচরণ, চণ্ডীপদ, চণ্ডীপ্রসাদ।

তবে দোয়াতের 'কালি', কয়লার 'কালি', জুতার 'কালি'তে ল'এ হ্রস্ব-ইকার দেওয়া উচিত।

রণজিৎ, রঞ্জিত

আর একটা গোলমাল দেখা যায় 'রঞ্জিত' বানানে। 'রঞ্জিত' শব্দে 'ৎ' হবে না, হবে 'ত'। কিন্তু 'রণজিৎ' লিখতে চাই 'ৎ'। তেমনি 'শক্রজিৎ, বিশ্বজিৎ' কিন্তু 'প্রদ্যোত, অচ্যুত'। 'রঞ্জিত, প্রদ্যোত, অচ্যুত' বানানে 'ৎ' দিলে ভুল হবে।

উচিত, কুৎসিত

'উচিত' শব্দে 'ৎ' দিলে অমার্জনীয় অপরাধ হবে। 'উচিত' লিখতে সর্বদা 'ত'। 'কুৎসিত' শব্দের প্রথম অংশে 'ৎ', পরের অংশে 'ত'। 'কুৎ' কিন্তু 'সিত'। কু'র পরে ৎ, সি'র পরে ত। এই দুই শব্দের বানানে সাবধান থাকতে হবে।

ক্ষালন, স্খলন

'ক্ষালন' শব্দের অর্থ 'মোচন, ধোয়া'; 'স্খলন' শব্দের অর্থ 'পতন, পিছলানো'। 'দোষক্ষালন, পদস্খলন'। 'দোষস্খলন' লিখলে ভুল হবে।

গগন, রসায়ন, দুর্নাম, দুর্নীতি

ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ। 'ফাল্গুন, গগন, ফেন' শব্দসমূহে যারা মূর্ধন্য-ণ ইচ্ছা করে, কবি তাদের 'বর্বর' আখ্যা দিয়েছেন। এ শব্দগুলিতে দন্ত্য-ন। তেমনি 'আগুন, বেগুন' শব্দদ্বয়ে দন্ত্য-ন। 'রসায়ন, আপ্যায়ন, মনীষী, মনীষা, অঙ্কন, শূন্য, দুর্নাম, দুর্নীতি' প্রভৃতি শব্দে মূর্ধন্য-ণ বসালে ভুল হবে। এসব শব্দে দন্ত্য-ন। খোদ 'মূর্ধন্য' শব্দেও কিন্তু ণ নয়, দন্ত্য-ন, এটাও খেয়াল রাখতে হবে।

নিত্য মূর্ধন্য-ণ

অণিমা, অণু (ক্ষুদ্র), আপণ (দোকান), কঙ্কণ, কণা, কণিকা, কল্যাণ, কাণ (একচক্ষুহীন), কোণ (রেখার সংযোগস্থল), গণ, গণনা, গণিকা, গুণ, গৌণ, ঘুণ, চাণক্য, চিক্কণ, তূণ, নিপুণ, পণ, পণ্য, পাণি, পুণ্য, ফণা, ফণী, বণিক্, বাণ, বাণিজ্য, বাণী, বিপণি, বীণা, বেণী, বেণু, মণি, মাণিক্য, লবণ, লাবণ্য, শণ, শাণিত, শোণ, শোণিত, স্থাণু।

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে হ্রস্ব-ইকার

অঞ্জলি	অতিথি	অদিতি	অদ্রি	অধিপতি
অনাদি	অভিসন্ধি	আরতি	আশিস্	ইত্যাদি
উপাধি	ক্ষিতি	গিরি	গ্রন্থি	চিকিৎসা
জটিল	জ্যামিতি	জ্যোতিষ	ঝটিতি	ত্রিদিব
দক্ষিণ	দরিদ্র	দিগ্বিদিক্	দিব্য	দ্রাঘিমা
নিধি	নিহিত	পরিধি	পরিমিতি	পাণিনি
প্রকৃতি	প্রগতি	প্রতিজ্ঞা	প্রতিবাদ	প্রতিষ্ঠা
বারিধি	বার্ষিক	মুরারি	রাশি	সারথি

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে দীর্ঘ-ঈকার

অতীত	অতীব	অধীন	অধীর	অধীশ্বর
অনীহা	অন্তরীপ	অভীষ্ট	অশরীরী	আকীর্ণ
আততায়ী	আত্মীয়	আনীত	আমলকী	আশীর্বাদ
ঈশ্বরী	উত্তরীয়	উদাসীন	উদীচী	উদীয়মান
উদ্গ্রীব	উদ্দীপন	উদ্দীপ্ত	উন্মীলন	উপবীত
উষ্ণীষ	একাকী	ওজস্বী	কীট	কীর্তন
গরীয়সী	দীর্ঘজীবী	নীরোগ	পরীক্ষা	প্রবীণ
প্রাচীন	বশীভূত	ভাগীরথী	মনীষী	মেধাবী
মীমাংসা	রথী	শ্রীমতী	সমীচীন	হৃষীকেশ

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে হ্রস্ব-উকার

অচ্যুত	অতুল্য	অত্যুক্তি	অদ্ভুত	অনুক্ত
উমা	উল্কা	উল্লিখিত	কম্বু	কার্মুক
কুটিল	কুণ্ডল	কুন্তল	কুহক	কুহর
কুম্ভ	গুহা	গুহ্য	তুলনা	দুর্গম
দুর্গা	পুণ্য	পুরাকাল	পুষ্প	বিদুষী
বিদ্যুৎ	বুভুক্ষা	ব্যুৎপত্তি	ভুক্ত	ভুজ
ভুবন	মরুৎ	মাধুরী	মুখ্য	মুমুক্ষু
মুহুর্মুহুঃ	শম্ভু	শুচি	শুল্ক	সুশ্রুত

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে দীর্ঘ-উকার

অক্রূর	অনসূয়া	অন্যূন	ঊন	ঊর্ধ্ব
ঊর্মি	ঊর্মিলা	ঊষর	ঊহ্য	কর্পূর
কূর্ম	কৌতূহল	গণ্ডূষ	চূষ্য	দূর্বা
পূজা	পূর্ত	পূর্ণ	পূর্ণিমা	পূর্ব
পূষন্	প্রভূত	প্রসূতি	বধূ	বিদ্রূপ
বিভূতি	ব্যূহ	ভূত	ভূমিকা	ভূয়সী
ভূরি	ভূষিত	ময়ূর	মূর্ছা	মূর্তি
যূথিকা	যূপকাষ্ঠ	রূঢ়	শার্দূল	স্ফূর্তি

নিম্নলিখিত শব্দগুলির হ্রস্ব-দীর্ঘ লক্ষণীয়

অক্ষৌহিণী	অনীকিনী	অভীপ্সিত	অনুগামিনী	অনুবর্তিনী
কাদম্বিনী	কালিন্দী	কীর্তি	কিরীটী	কিরীটিনী
চিকীর্ষা	জিগীষা	জীবিকা	দধীচি	দীপ্তি
দ্বিতীয়	নন্দিনী	নিরীক্ষণ	নিরীহ	নিশীথ
নিশীথিনী	নীতি	পিপীলিকা	পৃথিবী	প্রতিষ্ঠাত্রী
প্রীতি	বিজয়ী	বিজয়িনী	বিনীত	বিপরীত
বিভীষণ	ভগিনী	মরীচিকা	রীতি	শারীরিক
অনুকূল	ঊরু	নূপুর	মুমূর্ষু	মুহূর্ত

ব্য

ব্যক্ত	ব্যক্তি	ব্যগ্র	ব্যঙ্গ	ব্যজন
ব্যঞ্জক	ব্যঞ্জন	ব্যতিক্রম	ব্যতিব্যস্ত	ব্যতিহার
ব্যতীত	ব্যত্যয়	ব্যথা	ব্যপদেশ	ব্যবচ্ছেদ
ব্যবধান	ব্যবসায়	ব্যবস্থা	ব্যবহার	ব্যবহৃত
ব্যভিচার	ব্যয়	ব্যর্থ	ব্যসন	ব্যস্ত

ব্যা

ব্যাকরণ	ব্যাকুল	ব্যাখ্যা	ব্যাঘাত	ব্যাঘ্র
ব্যাজ	ব্যাদান	ব্যাধ	ব্যাধি	ব্যাপক
ব্যাপার	ব্যাপী	ব্যাপৃত	ব্যাপ্ত	ব্যাবহারিক
ব্যায়াম	ব্যাস	ব্যাসক্ত	ব্যাহত	ব্যাহৃতি

ষ্ক

আবিষ্কার	পরিষ্কার	বহিষ্কার	দুষ্কর	নিষ্কর
আবিষ্কৃত	পরিষ্কৃত	বহিষ্কৃত	দুষ্কৃতি	নিষ্কৃতি
দুষ্কর্ম	দুষ্কার্য	নিষ্কর্মা	নিষ্ক্রিয়	নিষ্কম্প
নিষ্ক্রয়	নিষ্কর্ষ	ধনুষ্কোটি	পুষ্কর	পুষ্করিণী
মস্তিষ্ক	মুষ্ক	চতুষ্ক	চতুষ্কোণ	বিষ্কম্ভক

অ-কার আ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণের পর সচরাচর ষ্ক।

স্ক

তস্কর	তিরস্কার	পুরস্কার	সংস্কার	নমস্কার
ভাস্কর	তিরস্কৃত	পুরস্কৃত	সংস্কৃত	অয়স্কান্ত
তিরস্করণী	শ্রেয়স্কর	যশস্কর	যশস্কাম	মনস্কাম

অ-কার আ-কারের পর সচরাচর স্ক।

ষ্প

পুষ্প	গোষ্পদ	নিষ্পত্তি	নিষ্পন্ন	নিষ্প্রভ	ভ্রাতুষ্পুত্র
দুষ্পাচ্য	দুষ্প্রবৃত্তি	চতুষ্পথ	চতুষ্পদ	চতুষ্পার্শ্ব	চতুষ্পাঠী

স্প

আস্পদ	প্রেমাস্পদ	শ্রদ্ধাস্পদ	স্নেহাস্পদ	পরস্পর
বনস্পতি	বাচস্পতি	বৃহস্পতি	স্পষ্ট	অস্পষ্ট
সুস্পষ্ট	স্পর্ধা	স্পর্শ	স্পন্দন	অস্পৃশ্য
নিস্পন্দ	নিঃস্পন্দ	স্পৃহা	নিস্পৃহ	নিঃস্পৃহ

ষ্ট

অষ্ট	ইষ্ট	অনিষ্ট	যথেষ্ট	কষ্ট
দষ্ট	নষ্ট	ভ্রষ্ট	স্পষ্ট	আদিষ্ট
নির্দিষ্ট	শিষ্ট	বিশিষ্ট	ক্লিষ্ট	তুষ্ট
তুষ্ট	সন্তুষ্ট	পরিতুষ্ট	পুষ্ট	রুষ্ট
আকৃষ্ট	নিকৃষ্ট	প্রকৃষ্ট	দৃষ্ট	অদৃষ্ট
ধৃষ্ট	হৃষ্ট	স্পৃষ্ট	সৃষ্ট	কষ্টি (পাথর)
ব্যষ্টি	সমষ্টি	যষ্টি (লাঠি)	ষষ্টি (ষাট)	বৃষ্টি
বিনষ্টি	মুষ্টি	মুষ্ট্যাঘাত	দৃষ্টান্ত	চেষ্টা
স্রষ্টা	দ্রষ্টা	দংষ্ট্রা	ইষ্টক	পিষ্টক

'ত' -প্রত্যয়ে ষ্ট, 'তি'-প্রত্যয়ে ষ্টি।

ষ্ঠ

ইষ্ঠ-প্রত্যয় :	শ্রেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	কনিষ্ঠ	বলিষ্ঠ	ঘনিষ্ঠ
	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	ভূয়িষ্ঠ	বর্ষিষ্ঠ	বরিষ্ঠ
	পাপিষ্ঠ	স্বাদিষ্ঠ			
স্থা-ধাতুজ :	কুষ্ঠ	গোষ্ঠ	নিষ্ঠ	নিষ্ঠা	নিষ্ঠুর
	প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠান	বিষ্ঠা	সুষ্ঠু	সৌষ্ঠব
অন্যথা সিদ্ধ :	কোষ্ঠ	কোষ্ঠী	গোষ্ঠী	নিষ্ঠীবন	
	পৃষ্ঠ	পৃষ্ঠা	ষষ্ঠ	ষষ্ঠী	

স্ত, স্থ

ক্ত-প্রত্যয়ান্ত : অভ্যস্ত, আশ্বস্ত, পরাস্ত, বিন্যস্ত, বিশ্বস্ত, ব্যস্ত, সন্ত্রস্ত, সমস্ত।

গ্রস্ত (গ্রস্+ত), অভাবগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, শোকগ্রস্ত।

স্থা-ধাতুজ : অবস্থান, অস্থায়ী, অস্থাবর, কণ্ঠস্থ, গৃহস্থ, গার্হস্থ্য, তদবস্থ, ব্যবস্থা, মধ্যস্থ, মুখস্থ, সুস্থ, স্বাস্থ্য।

অন্তঃ + তল = অন্তস্তল ; বক্ষঃ + স্থল = বক্ষঃস্থল।

অস্তি = আছে ; অস্থি = হাড়।

ত্ব, ত্ত্ব, ত্ত, ত্তা

মনুষ্য + ত্ব = মনুষ্যত্ব। তদ্বৎ দেবত্ব, পুরুষত্ব, বীরত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষত্ব, পটুত্ব, মমত্ব, রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব।

মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব, বৃহৎ + ত্ব = বৃহত্ত্ব, তদ্ + ত্ব = তত্ত্ব।

আ + যৎ + ত = আয়ত্ত।

সৎ + তা = সত্তা, সৎ + ত্ব = সত্ত্ব, স্ব + ত্ব = স্বত্ব।

ণ্ম, ন্ম

হিরণ্ময় মৃন্ময়

ষাণ্মাসিক ঈষন্মাত্র

ক্ক, ক

ক্ক : চিক্কণ, ধিক্কার, ন্যক্কার, লুক্কায়িত, বৃক্ক, পৃথক্করণ, ফক্কিকার।

ক : পক্ব, ক্বচিৎ, ক্বাথ।

য [শুধু য-ফলা]

অত্যধিক	অত্যন্ত	অত্যল্প	অধ্যবসায়	অধ্যয়ন
অভ্যন্তর	অন্ত্যার্থক	আদ্যন্ত	ইত্যবসরে	গত্যন্তর
চ্যবন	জাত্যভিমান	ত্যক্ত	দ্ব্যক্ষর	দ্ব্যর্থ

দ্ব্যশীতি ন্যস্ত প্রত্যন্ত প্রত্যর্পণ প্রত্যবায়
যদ্যপি রাত্র্যন্ধ স্যন্দন সন্ন্যস্ত স্যমন্তক

্যা [য-ফলা + আ-কার]

অত্যাবশ্যক অদ্যাপি অধ্যাত্ম অন্যান্য অভ্যাগত
কাত্যায়নী জ্যামিতি ত্যাজ্য ন্যায় ন্যায্য
ধ্বন্যাত্মক নাট্যাভিনয় প্রত্যাদেশ প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা
শ্যামা শ্যালিকা সত্যানুরাগ সত্যানুসন্ধান সন্ন্যাসী

বৈদেশিক শব্দে শ

আতশ আদমশুমার আয়েশ আশকারা আশরফি
ইংলিশ ইশকাপন ইশাদি ইশারা কিশমিশ
কুর্নিশ ক্যাশ খরগোশ খুশকি খুশি
খোশামোদ চশমা ডিশ তল্লাশ তামাশা
তোশক তোশাখানা দুশমন নকশা নালিশ
নাশপাতি পশম পাপোশ পেশা পোশাক
ফরমাশ ফরাশ ফ্যাশন বকশি বখশিশ
বদমাশ বারকোশ বালাপোশ বুরুশ বেহুঁশ
মশগুল মশাল মুনশি মুশকিল রেশম
লশকর লাশ শখ শনাক্ত শয়তান
শরবৎ শরম শরিক শর্ত শহর
শহিদ শাগরেদ শাদি শাবাশ শামলা
শামিয়ানা শামিল শায়েস্তা শার্ট শালগম
শাসি শাহ্জাদা শাহানা শিয়া শিরনি
শুরু শুরুয়া শেমিজ শোরগোল শোরা
শোহরৎ শৌখিন হামেশা হুঁশ হুঁশিয়ার

বৈদেশিক শব্দে স

অগস্ট	অফিস	অর্সা	অর্সানো	আপস
আফসোস	আসমান	ইসফগুল	উসুল	ওয়ারিস
কসাই	কসুর	কার্নিস	ক্লাস	খসড়া
খালাস	খাস	খাসা	খোস (পাঁচড়া)	খোসা
গ্যাস	গ্লাস	জলসা	জলুস	জিনিস
ডিস্‌মিস্‌	তসর	তহসিল	নসিব	নোটিস
পসরা	পসার	পাস-ফেল	পুলিস	ফেসাদ
বিস্‌মিল্লা	ব্যারিস্টার	মজলিস	মরসুম	মসলা
মাসুল	মাস্টার	ম্যাজিস্ট্রেট	রসিদ	রেজিস্টারি
লোকসান	সমন (summons)	সস্তা	সহিস	সাদা
সায়া	সাল (সন)	সালিস	সিক	সুটকেস
সুন্নি	স্টীমার	স্ট্যাম্প	হদিস	হাসিল

সমোচ্চারিত শব্দ

অংশ—ভাগ	অকিঞ্চন—নিঃস্ব
অংস—স্কন্ধ	আকিঞ্চন—ইচ্ছা
অণু—ক্ষুদ্রতম অংশ	অন্ন—খাদ্য
অনু—পশ্চাৎ	অন্য—অপর
অশ্ম—প্রস্তর	অস্তি—আছে
অশ্ব—ঘোড়া	অস্থি—হাড়
অস্থায়ী—অল্পকাল স্থায়ী	আপণ—দোকান
আস্থায়ী—গানের প্রথম পদ	আপন—নিজ
আবরণ—আচ্ছাদন	আভাষ—ভূমিকা
আভরণ—অলঙ্কার	আভাস—ইঙ্গিত

আস্তিক—ঈশ্বরবিশ্বাসী
আস্তীক--মুনিবিশেষ

আহুতি—হোম
আহূতি—আহ্বান

উপাদান—উপকরণ
উপাধান—বালিশ

উদ্যত—প্রবৃত্ত
উদ্ধত—ধৃষ্ট

কটি—কোমর
কোটি—শতলক্ষ

কপাল—ললাট
কপোল—গাল

কমল—পদ্ম
কোমল—নরম

কুজন—খারাপ লোক
কূজন—পাখীর ডাক

কুল—বংশ
কূল—নদীর তীর

কৃত—করা
ক্রীত—কেনা

কৃতি—কার্য
কৃতী—কৃতকর্মা

গর্ব—অহঙ্কার
গর্ভ—ভিতর

গাথা—কবিতা
গাঁথা—গ্রন্থন করা

গিরিশ—মহাদেব
গিরীশ—হিমালয়, মহাদেব

গোলক—গোলাকার বস্তু
গোলোক—বৈকুণ্ঠ

চড়ক—উৎসববিশেষ
চরক—আয়ুর্বেদবেত্তা ঋষিবিশেষ

চির—বহুকাল
চীর—বস্ত্রখণ্ড

জড় – অচেতন
জ্বর—রোগবিশেষ

টিকা—কয়লাগুঁড়ার চাকতি
টীকা—ব্যাখ্যান

তদীয়—তাহার
ত্বদীয়—তোমার

দিন—দিবস
দীন—দরিদ্র

দীপ—বাতি
দ্বিপ—হস্তী
দ্বীপ—জলবেষ্টিত স্থল

দূত—বার্তাবহ
দ্যূত—পাশাখেলা

ধনী—ধনবান্
ধ্বনি—শব্দ

নীড়—পাখীর বাসা
নীর—জল

পড়া—পাঠ করা
পরা—পরিধান করা

পরশ্ব—পরশু
পরস্ব—পরের ধন

পরিষদ্—সভা
পারিষদ—সভাসদ্

প্রকৃত—যথার্থ
প্রাকৃত—স্বাভাবিক

বর্শা—সড়কি
বর্ষা—ঋতুবিশেষ

বাড়ী—বাটী
বারি—জল

বিস্মিত—আশ্চর্যান্বিত
বিস্মৃত—যাহা মনে নাই

মুখ—আনন
মূক—বোবা

দেশ—ভৌগোলিক বিভাগ
দ্বেষ—ঈর্ষা

নিতি—নিত্য
নীতি—বিধান

পক্ষ—পাখা
পক্ষ্ম—নেত্রলোম

পদ্ম—পুষ্পবিশেষ
পদ্য—ছন্দোবদ্ধ রচনা

পরিচ্ছদ—পোশাক
পরিচ্ছেদ—গ্রন্থের বিষয়-বিভাগ

প্রকার—রকম
প্রাকার—দেয়াল

প্রসাদ—অনুগ্রহ
প্রাসাদ—অট্টালিকা

বাণ—শর
বান—বন্যা

বিনা—ব্যতীত
বীণা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ

ভাষা—ভাবপ্রকাশক শব্দাবলী
ভাসা—ডুবিয়া না যাওয়া

মেদ—চর্বি
মেধ—যজ্ঞ

কতিপয় শব্দের বানান

লক্ষ—শত সহস্র
লক্ষ্য—উদ্দেশ্য

শয্যা—বিছানা
সজ্জা—সাজ

শরণ—আশ্রয়
স্মরণ—স্মৃতি

শিকড়—মূল
শীকর—জলকণা

শীত—ঠাণ্ডা
সিত—সাদা

শূর—বীর
সুর—দেবতা, স্বর

শ্মশ্রু—দাড়ি
শ্বশ্রূ—শাশুড়ী.

সত্ত্ব—অস্তিত্ব
স্বত্ব—মালিকানা

সুত—পুত্র
সূত—সারথি

শব—মৃতদেহ
সব—সকল

শর—বাণ
সর—দুধের উপর ঘনীভূত স্তর

শাপ—অভিসম্পাত
সাপ—সর্প

শিকার—মৃগয়া
স্বীকার—অঙ্গীকার

শুচি—পবিত্র
সূচি, সূচী—ছুঁচ, নির্ঘণ্ট

শ্রবণ—শোনা
স্রবণ—ক্ষরণ

ষষ্টি—ষাট
ষষ্ঠী—ষষ্ঠ'র স্ত্রীলিঙ্গ

সর্গ—গ্রন্থের পরিচ্ছেদ
স্বর্গ—দেবলোক

স্কন্দ—কার্তিকেয়
স্কন্ধ—কাঁধ

প্রতিবর্ণীকরণ

বাঙ্গালী হিন্দু নামের ইংরেজী প্রতিবর্ণীকরণ-সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষযাবৎ একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। এই পদ্ধতি ভাল কি মন্দ, ত্রুটিমুক্ত কি ত্রুটিযুক্ত তাহা এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় নহে। পদ্ধতিটি কী এবং কোথায় কোথায় ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা আছে তাহাই এখানে দেখানো হইতেছে।

সাধারণের মধ্যে একটা সংস্কার আছে নামের বানানে ভুল নাই, যাহার যাহা খুশি লেখা চলিতে পারে। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে নামের বানান করিলে কার্যক্ষেত্রে যে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় এই সত্যটি ১৮৬৭ সালেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপলব্ধি করিয়াছিলেন :

"On 26 January, 1867, the Syndicate expressed the desirability of taking steps to secure the adoption of a uniform system of spelling of Indian proper names in the Roman character, and requested the Faculty of Arts to consider and report on the subject. The Faculty in their turn appointed a sub-committee for the purpose."

—*Hundred Years of the University of Calcutta*

১৮৬৭ সালের ২০ জুলাই Faculty of Arts-এর সভায় Sub-committee-র রিপোর্ট আলোচিত হয়। সেই সভায়—

"It was proposed by Moulovi Abdool Luteef Khan Bahadoor and seconded by Baboo Khetter Mohun Chatterjea :—

That the Sub-committee be requested to reconsider the question, and that the following gentlemen be added to the list of members :—

Mr W. S. Atkinson,

Rev. E. C. Stuart,

Raja Kally Kissen Bahadoor,

Koomar Hurendra Krishna Rai Bahadoor,

Baboo Prosunno Coomar Surbadhicarry,

The proposal was carried."

—Minutes of the University of Calcutta 1867-68

১৮৬৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর Faculty of Arts-এর সভায় সাব-কমিটির পুনর্বিবেচিত প্রতিবেদন পঠিত হয়—

"In the opinion of the Sub-Committee it is highly desirable, therefore, that this evil should be remedied, and measures should be taken to secure general uniformity in the spelling of Oriental words in the Roman character. They accordingly recommend that the University should adopt a uniform system for the transliteration of native names and terms in all their registers and records, and direct the attention of Heads of Colleges and Schools to the propriety of teaching their pupils to spell their names according to that system.

The System, that appears to the Sub-Committee as the best adapted for the purpose, is that of Sir William Jones as modified by the late Professor H. H. Wilson. It is founded entirely upon the English alphabet; it is remarkable for its simplicity and precision; has extensive currency both in India and Europe; and is more likely to be accepted by the public generally than any other."

—Calcutta University Minutes 1867-68

সাব-কমিটি Prof. H. H. Wilson-এর পদ্ধতি গ্রহণ করার সুপারিশ করিলেও কয়েকটি ব্যতিক্রমের নির্দেশ দিয়াছিলেন :

"The exceptions to which allusion has been made above are—

1. The Initial য to be represented by j and not y

2. The Initial জ্ঞ to be represented by g (gn, gy ?) and not jn

3. ক্ষ to have for its equivalent kh in the case of Bengalis, and chh in the case of Hindusthanis

4. অ final to be omitted after single consonants, when not sounded."

কিন্তু Calcutta University Calendar-এ দেখা যাইতেছে ইহার পরেও কয়েক বৎসর পর্যন্ত সাব-কমিটির সুপারিশ পূরাপূরি গৃহীত হয় নাই। ধাপে ধাপে কিছু কিছু গ্রহণ করা হইলেও সবটা কখনও গ্রহণ করা হয় নাই। Calendar-এ নামের বানানে বার-বার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু minutes-এ এইসব পরিবর্তনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হইতেছে, সাময়িক বিজ্ঞপ্তিদ্বারাই এইসব সংস্কার সাধিত হইয়াছে। তবে ১৮৬৯ সালে প্রতিবর্ণীকরণের যে-পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে অদ্যাবধি (১৮৭৮) মোটামুটি সেই ধারাই চলিতেছে। সাব-কমিটির রিপোর্টের পূর্বে ও পরে অর্থাৎ ১৮৬৭ সালের পূর্বে এবং ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত ক্যালেণ্ডারে বানানের যে-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখানে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

1861—1867

Ashutosh, Ashootosh, Aushootosh ; Aukhoy, Okhoy ; Aubinash, Obinash ; Umbica.

Behary ; Bhoobun ; Bhuttacharjea ; Boikuntha ; Busunto Coomer Ghose.

Durga Doss Ghose.

Jodoo ; Joggessur ; Jadub.

Keshub, Kessub ; Kheroda ; Khetter.

Shib ; Shoshee Bhoosun Dutt ; Shama, Shyama ; Shreesh Chunder ; Soorjo, Soorjee.

স্পষ্টই বোঝা যায় ১৮৬৭ সালের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে নামের বানানে কোন বিশেষ নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না, যিনি যেমন ইচ্ছা লিখিতেন।

1868—1873

A´sutosh, Amvika´, Avina´s, Akshay, A´cha´ryya, Kesav, Khirod, Kshirod, Kshetra, Govinda, Gna´n, Navin, Viha´ri, Biha´ri, Bhatta´cha´ryya, Bhatta´cha´rya, Bhuvan, Jagneswar, Ja´dav, Sasi, Sivcharan, Sya´ma´, Suryya.

সাব-কমিটির রিপোর্ট-অনুযায়ী বানান-রীতি পরিবর্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সাব-কমিটির সর্ববিধ নির্দেশ গ্রহণ করা হয় নাই। v দিয়াই অন্তঃস্থ-ব লেখা হইতেছে, ক্ষ লিখিতে ksh দেওয়া হইতেছে; রিপোর্টে ছিল যথাক্রমে b এবং kh। মাঝে মাঝে নিয়মের স্খলনও দেখা যায়—Khirod Kshirod, Beha´ri Viha´ri, Bhatta´cha´ryya Bhatta´cha´rya। আবার অতিরিক্ত উৎসাহে একটা বড় রকমের ভুলও এই সময়ে চলিতেছিল। 'অম্বিকা' বানানে v ব্যবহার করা হইত, কিন্তু ম'এর সঙ্গে যুক্ত ব কখনও অন্তঃস্থ হয় না, ওটা বর্গ্য-ব।

আ বানানে a´ অর্থাৎ a-এর মাথায় বৈশিষ্ট্যসূচক (diacritical) চিহ্ন লক্ষণীয়।

1875—1878

Asutosh, Amvika, Avinas, Akshay, Apurva, Acharyya, Kesav, Kshirod, Gnan, Devendra, Navin, Navadwip, Bhagavati, Bhuvan, Jadav, Revati, Binodvihari, Bijaygovinda, Sivchandra, Sivaprasad, Syama, Suryya.

বানান একই আছে, তবে আ লিখিতে আর a´ ব্যবহার করা হয় না, শুধু a দেওয়া হইতেছে। স্থানে স্থানে অসঙ্গতিও আছে, যেমন Binodvihari, Bijaygovinda—অন্তঃস্থ-ব'এ b ও v দুইটাই ব্যবহার করা হইতেছে।

সাব-কমিটির সুপারিশ-অনুযায়ী জ্ঞ বানানে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত gn পাওয়া যায়, ১৮৮৮ হইতে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালী নামে জ্ঞ'র বর্ণান্তরে jn চলিতেছে।

১৮৭৯ সালে বানান-রীতি পুনরায় পরিবর্তন করা হইয়াছে—এবং এই রীতিই (জ্ঞ বানান ব্যতীত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিষ্ঠাসহকারে আজ পর্যন্ত পালন করিয়া আসিতেছেন। ভ্রমপ্রমাদ একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে, একটি সুবিখ্যাত নামেই প্রমাদ দেখা যায়—Subhaschandra Basu হওয়া উচিত ছিল Subhash-chandra Basu। এইজাতীয় অসামঞ্জস্য অবশ্য করণিক-প্রমাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মোটের উপর, একশত বৎসর পর্যন্ত Calcutta University Calendar-এ একটা বানান-সাম্য রক্ষিত হইয়াছে।

১৯৫১ সালে স্থাপিত হয় মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ; ১৯৫২ সালেই পর্ষদের প্রথম পরীক্ষা হয় School Final Examination। পর্ষৎ-কর্তৃপক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবর্ণীকরণ-পদ্ধতির উপর কোন গুরুত্ব দিলেন না। ফলে দেখা গেল পর্ষৎ-প্রদত্ত সার্টিফিকেটে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নামে বানানের কোন শৃঙ্খলা নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই স্বৈরাচার স্বীকার করিয়া লইলেন না, তাঁহারা যথারীতি তাঁহাদের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া নামের বানান করিতে থাকিলেন। School Final Certificate-এর বানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত ডিপ্লোমার বানানে ঐক্য না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা বিপদে পড়িল। বৈষয়িক ব্যাপারে নানা গোলযোগ দেখা দিল। অল্পকালমধ্যেই মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ নিজেদের ভ্রম উপলব্ধি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণান্তর-প্রণালী অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিলেন। ১৯৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ বিদ্যালয়-প্রধানগণের নিকট যে-নির্দেশপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য তাহা এখানে উপস্থাপিত করিতেছি।—

Board of Secondary Education, West Bengal

No. C/56/21

Dated the 17th Nov., 1955

To

The Heads of all High Schools

Sub : Spelling of the names and surnames of Bengali Hindu candidates for the School Final Examination.

Dear Sir/Madam,

The University of Calcutta follows a standardised practice of transliteration of the names and surnames of Bengali Hindu students. Successful candidates of the School Final Examination who later on got themselves admitted into the Calcutta University came to difficulty as the University followed their own spellings in respect of these candidates and certificates issued by the University bore the same spellings. The result was that many of these candidates were put to trouble in establishing their identity as their names were not spelt in the same way in the certificates issued by the Board and the University.

The University brought the matter to our notice and requested us to follow the same method of spelling as they do in order to obviate this difficulty. The Board accepted the recommendation.

I am, therefore, directed to request you to be so good as to follow the method of transliteration as incorporated in the enclosure while writing the names of Bengali Hindu candidates for the School Final Examination on their application forms, as well as in the Statement Form No. 7 (a).

This may be treated as most important as a mistake in spelling on the part of the school or the candidate may put the latter into difficulties.

This system of spelling should also be followed as far as practicable in your school registers.

Yours faithfully,
Sd/ B. Ghosh
Asstt. Secretary (Examinations)

কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবৎসরকাল একটি বিশেষ নিয়ম মানিয়া চলিলেও এবং মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ বিদ্যালয়-প্রধানদের হুঁশিয়ার করিয়া দিলেও কেবল সাধারণ লোক নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতও এই প্রতিবর্ণীকরণ-পদ্ধতি-বিষয়ে সম্যক্ অবহিত বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা অনাবশ্যক নহে।

এইবার পদ্ধতিটি কী বোঝা যাক। সর্বপ্রথমে বাংলা বর্ণগুলির ইংরেজী বর্ণে লিপ্যন্তর-প্রণালী অনুধাবন করি—

অ, আ = a　　ই, ঈ = i　　উ, ঊ = u
ঋ = ri　　এ = e　　ঐ = ai
ও = o　　ঔ = au

ক = k　খ = kh　গ = g　ঘ = gh　ঙ = n
চ = ch　ছ = chh　জ = j　ঝ = jh　ঞ = n
ট = t　ঠ = th　ড = d　ঢ = dh　ণ = n
ত = t　থ = th　দ = d　ধ = dh　ন = n
প = p　ফ = ph　ব = b　ভ = bh　ম = m

য = আদ্যবর্ণে j,　মধ্যবর্ণে j বা y,　য-ফলায় ÿ
র = r　ল = l　অন্তঃস্থ-ব = b,　ব-ফলায় w
শ = s　ষ = sh　স = s　হ = h
ক্ষ = ksh　ং = n　ঃ = h　ঁ = n
য় = y　জ্ঞ = jn　ড় = r

অতঃপর প্রয়োগ-প্রণালী এবং সচরাচর কোথায় কোথায় ভুল হয় আলোচনা করি।

অ, আ = A

অ আ সর্বদা সর্বত্র **a** [কদাপি o, u, e, i নহে]।

তবে অন্ত্য অ উচ্চারিত না হইলে শব্দান্তে **a** দিতে হয় না।

অমল = Amal   অলক = Alak   আশা = Asa

অমলা = Amala   অলকা = Alaka   কানাই = Kanai

অমলাভ = Amalabha (অন্ত্য অ উচ্চারিত)।

ভদ্র, ভদ্রা = Bhadra   পদ্ম, পদ্মা = Padma   স্বপ্ন, স্বপ্না = Swapna

অরবিন্দ = Arabinda (Aurobindo নহে)।

অর্ধেন্দু = Ardhendu (Ordhendu নহে)।

মণি = Mani (Moni নহে)।   শমী = Sami (Somi নহে)।

তরু = Taru (Toru নহে)। শম্ভু = Sambhu (Sombhu নহে)।

ব্রজ = Braja (Brojo নহে)। প্রবীর = Prabir (Probir নহে)।

হিরণ, কিরণ, হরেন, বরেন, বরুণ, তরুণ, কণিকা, মণিকা = Hiran, Kiran, Haren, Baren, Barun, Tarun, Kanika, Manika (Hiron, Kiron, Horen, Boren, Borun, Torun, Konika, Monika নহে)।

হালদার = Haldar (Halder নহে)।

সরকার = Sarkar (Sarker নহে)।

রায় = Ray (Roy নহে)। (Rai = রাই)।

দত্ত, মিত্র, চন্দ্র = Datta, Mitra, Chandra।

দাস, পাল, নাগ = Das, Pal, Nag।

চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য = Chakrabarti, Bhattacharya।

(যাহারা এখনও Sircar, Roye, Dutt, Mitter, Chunder, Doss, Paul, Naug, Chuckervertty, Bhattacharjee লেখে তাহারা বোধ হয় নিজেদের বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে।)

বসু = Basu (Bose বানান-সম্বন্ধে ও = O দ্রষ্টব্য)।

সচরাচর অ-কারান্ত সংযুক্ত বর্ণে অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। কিন্তু অন্ত্যাক্ষর সংযুক্ত না হইলেও ক্ষেত্রবিশেষে অ-ধ্বনি বজায় থাকে :

রমাপদ, রাধাপদ, হরিপদ, কালীপদ = Ramapada, Radhapada, Haripada, Kalipada।

অমৃতাভ, পদ্মনাভ = Amritabha, Padmanabha।

প্রিয়, অমিয় = Priya, Amiya ; প্রিয়া, অমিয়া একই বানানে চলে। (Preo, Amio বানান চলিবে না।)

অন্ত্য অ উচ্চারিত না হইলে—

জয়, অজয়, সঞ্জয়, অভয়, অক্ষয়, তন্ময়, জগন্ময় = Jay, Ajay, Sanjay, Abhay, Akshay, Tanmay, Jaganmay।

(এইসব নামে অনেকেই -ay না লিখিয়া -oy লিখিয়া থাকেন ; এই প্রবণতা পরিহার করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানে Joy, Ajoy, Sanjoy জাতীয় বানান পরিত্যাজ্য।)

প্র = **Pra** [কদাপি Pro নহে]।

প্রণব, প্রকাশ, প্রতাপ, প্রসাদ, প্রবাল, প্রশান্ত, প্রতুল, প্রসূন, প্রবোধ, প্রদ্যোত, প্রতিমা, প্রতিভা, প্রমীলা, প্রগতি, প্রণতি, প্রকৃতি = Pranab, Prakas, Pratap, Prasad, Prabal, Prasanta, Pratul, Prasun, Prabodh, Pradyot, Pratima, Pratibha, Pramila, Pragati, Pranati, Prakriti—(এইসব নামে কখনও Pro চলিবে না)।

ই, ঈ = I

ইলা = Ila ইন্দিরা = Indira অসিত = Asit

ঈশান = Isan ঈশ্বর = Iswar অসীম = Asim

আরতি, মিনতি, মিঠি, মিনি, শান্তি, কান্তি = Arati, Minati, Mithi, Mini, Santi, Kanti।

বিপিন, বিজন, বিজয়, বিনয়, বিমান, বিতান, বিহারী = Bipin, Bijan, Bijay, Binay, Biman, Bitan, Bihari।

(এইসব নামে প্রায়ই দেখা যায় Bi স্থানে Be লেখা হয়। Bepin, Benoy, Beetan, Behary প্রভৃতি বিদ্‌ঘুটে বানান, কখনও এরূপ না লেখা হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।)

ঈ সর্বদা i [কদাপি ee বা y নহে]।

ঈ বানানে ভুল বড় বেশী হয়, এই বানানটি-সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে হইবে।

শ্রী = Sri শ্রীলা = Srila শ্রীমতী = Srimati

দেবী = Debi গাঙ্গুলী = Ganguli

(কখনও Sree, Sreela, Sreematee, Srimaty, Deby, Ganguly লেখা চলিবে না।)

বীণা, লীলা, বাণী, রাণী, শান্তশ্রী, শুভ্রশ্রী, শ্রাবন্তী, সেমন্তী, শাশ্বতী, ভারতী, অবনী, রমণী, রথীন্দ্র, বারীন্দ্র, তীর্থঙ্কর, দীপঙ্কর = Bina, Lila, Bani, Rani, Santasri, Subhrasri, Srabanti, Semanti, Saswati, Bharati, Abani, Ramani, Rathindra, Barindra, Tirthankar, Dipankar।

(Beena, Leela, Ranee, Teerthankar প্রভৃতি লেখার অভ্যাস বদলাইতে হইবে।)

হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ এক নামে থাকিলেও সর্বদা i :

দীপ্তি, দীপালি, শিবানী, নলিনী = Dipti, Dipali, Sibani, Nalini।

শীল = Sil (Seal নহে)।

চক্রবর্তী = Chakrabarti (-ty নহে)।

চৌধুরী = Chaudhuri (-ry নহে)।

উ, ঊ = U

উ, ঊ সর্বদা u [কদাপি o, oo, wo, woo নহে]।

উমা = Uma ঊর্মিলা = Urmila

(পূর্বযুগের Omichand, Gooroodas, Baboo, Hindoo, Womes, Woosha ভুলিয়া যাইতে হইবে।) বর্তমান বানান— উমিচাঁদ = Umichand, গুরুদাস = Gurudas, বাবু = Babu, হিন্দু = Hindu, উমেশ = Umes, ঊষা (উষা) = Usha।

গুহ = Guha (Goho নহে)।

উলপুর = Ulpur (Olpore নহে)। কাশীপুর—Kasipur (Cossipore নহে)।

খুকু, মিতু, শিবু, নিমু, অশ্রু, পুতুল, পারুল, বুলা, কুন্তলা = Khuku, Mitu, Sibu, Nimu, Asru, Putul, Parul, Bula, Kuntala—(কোথাও oo নহে)।

পূষন্‌, ভূষণ, নূপুর, পূর্ণ, সূর্য, ধূর্জটি = Pushan, Bhushan, Nupur, Purna, Surya, Dhurjati—(কোথাও oo নহে)।

ঋ = Ri

ঋষি, ঋতু, ঋদ্ধি = Rishi, Ritu, Riddhi।

নৃপ, ভৃগু, তৃপ্তি = Nripa, Bhrigu, Tripti।

কৃত্যপ্রিয় = Krityapriya (কৃ = kri, প্রি = pri)।

এ = E

এলা = Ela এষা = Esha

রেবা, মেঘলা, হেলেন, ভবেশ, ভূপেশ, অমলেন্দু, বিমলেন্দু = Reba, Meghla, Helen, Bhabes, Bhupes, Amalendu, Bimalendu।

এ সর্বদা e [কদাপি ey বা ay নহে]।

দে = De (Dey বা Day নহে)।

সেন = Sen (Seyne নহে)।

ঐ = Ai

ঐ সর্বদা ai [কদাপি oi নহে]।

ঐশী = Aisi

মৈত্র = Maitra (Moitra নহে)।

কৈলাস, চৈতন্য, ত্রৈলোক্য, বৈকুণ্ঠ, ভৈরব, শৈবাল, শৈলজা = Kailas, Chaitanya, Trailokya, Baikuntha, Bhairab, Saibal, Sailaja।

গৈলা, নৈহাটি = Gaila, Naihati (Goila, Noihati নহে)।

ও = O

ওঝা = Ojha

ভোলা = Bhola গোপাল = Gopal মোহর = Mohar

ও-কারে কোথাও ভুল হয় না, সকলেই o লেখেন। তবে ও-কার-যুক্ত নামে ভুল হয় অন্যত্র। ও-কারের পর যদি একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে এবং সেই বর্ণ স্বরান্ত না হয়, প্রচলিত বানানে একটা অতিরিক্ত e ব্যবহার করা হয়। অশোক, ক্ষীরোদ, গোপ, সোম প্রভৃতির বর্ণান্তরে সচরাচর লেখা হয় Asoke, Kshirode, Gope, Some। ইংরেজী রীতিতে এই বানান বিসদৃশ নয়—তবে বিশ্ববিদ্যালয়-বিধানে শব্দান্তের e বর্জন করা হইয়াছে। উক্ত নামগুলির স্বীকৃত বানান—Asok, Kshirod, Gop, Som।

ঐতিহাসিক 'অশোক' নামের বানান Asoka। এই নজিরে Asoka, Kshiroda, Gopa, Soma লিখিলে বাঙ্গালী নাম হইয়া যাইবে অশোকা, ক্ষীরোদা, গোপা, সোমা। এইজাতীয় নামের বর্ণান্তরে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, শব্দান্তে কদাচ e চলিবে না—

অশোক, অলোক, গোলোক = Asok, Alok, Golok।

ক্ষীরোদ, বিনোদ, প্রমোদ = Kshirod, Binod, Pramod।

সরোজ, মনোজ = Saroj, Manoj।

হোর, কিশোর = Hor, Kisor।

সোম, হোম = Som, Hom (Home নহে)।

গোপ, লোদ, কোল = Gop, Lod, Kol।

কিন্তু Nirod, Niroj বানান ঠিক নহে; কারণ নীরোদ, নীরোজ অশুদ্ধ শব্দ। শুদ্ধ শব্দ নীরদ, নীরজ; অতএব বানান হইবে Nirad, Niraj।

'ঘোষ, বসু'-কে অনেকে লেখেন Ghose, Bose। ১৮৬৭ সালে ১৮ সেপ্টেম্বরের সভায় গৃহীত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবেও এই দুইটি বানানকে ব্যতিক্রম-পর্যায়ে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু পরে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে ঘোষ-এর বর্ণান্তরে Ghose চলিবে না, লিখিতে হইবে Ghosh।

বসু-স্থলে Bose বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিধানে অচল বটে, কিন্তু এই বানানকে আর হটানো যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ঘোষ-এর সাদৃশ্যে মৌখিক ভাষায় বসু-কেও বলা হয় বোস। যদিও সাধুভাষায় বোস শব্দ স্থান পায় নাই, ইংরেজী কায়দায় বসু-স্থলে Bose বানান বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। এই বানান এতই প্রতিষ্ঠিত যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম-অনুসারে Bos বানান কল্পনাই করা যায় না। ইংরেজী অক্ষরে Basu, Bose দুই বানানই বেশ চলিতেছে—তবে Bose বানান যথাসম্ভব পরিহার করাই ভাল।

ঔ—Au

ঔ সর্বদা **au** [কদাপি ou বা ow নহে]।

গৌরী = Gauri (Gouri নহে)।

গৌতম = Gautam (Goutam নহে)।

সৌমিত্র, সৌম্য, সৌরভ = Saumitra, Saumya, Saurabh। চৌধুরী, ভৌমিক = Chaudhuri, Bhaumik (**সতত সাবধান থাকিতে হইবে, কদাচ** **Chowdhury, Bhowmik** **বা** **Choudhuri, Bhoumik** **লেখা না হয়**)।

ক—K, খ—Kh

ক সর্বদা K [কদাপি c, ck, q নহে]।

কনক = Kanak খোকন = Khokan খগেন = Khagen

কার্তিক = Kartik (Kartic, Kartick, Cartik প্রভৃতি চলিবে না)।

তিনকড়ি = Tinkari (Tincowrie নহে)।

কুমার = Kumar (Coomer নহে)।

হিন্দু নামে কখনও q চলে না।

গ = G, ঘ = Gh

গগন = Gagan গীতা = Gita

ঘনশ্যাম = Ghanasyam অঘোর = Aghor

ঙ = N

কোঙার = Konar

অঙ্কন = Ankan শঙ্খ = Sankha গঙ্গা = Ganga

সঙ্ঘমিত্রা = Sanghamitra

চ = Ch, ছ = Chh

চিত্ত = Chitta চুনি = Chuni অর্চনা = Archana

ছবি = Chhabi ছায়া = Chhaya

চ্চ = Chch, চ্ছ = Chchh

সচ্চিৎ = Sachchit বাচ্চু = Bachchu

স্বচ্ছশীলা = Swachchhasila

জ = J, ঝ = Jh

জয়া = Jaya অজিত = Ajit জীবন = Jiban

উজ্জ্বল = Ujjwal অর্জুন = Arjun

জ সর্বদা j [কদাপি z নহে]।

মজুমদার = Majumdar (Mazumdar নহে)।

হাজরা = Hajra (Hazra নহে)।

ঝর্না = Jharna ঝন্টু = Jhantu ঝুমুর = Jhumur

ঞ = N

কাঞ্চন = Kanchan পঞ্চমী = Panchami সঞ্চিতা = Sanchita

বাঞ্ছা = Banchha

অঞ্জলি = Anjali রঞ্জিত = Ranjit মঞ্জু = Manju

ঝঞ্ঝা = Jhanjha

ট = T, ঠ = Th

ঘটক = Ghatak টুলু = Tulu তুষ্ট = Tushta

পাঠক = Pathak ঠাকুর = Thakur গোষ্ঠ = Goshtha

ড = D, ঢ = Dh

ডালিম = Dalim ঢুলি = Dhuli

ডোরা = Dora ঢোল = Dhol

ণ = N

কল্যাণ = Kalyan অণিমা = Anima অর্ণব = Arnab

পিণ্টু = Pintu শ্রীকণ্ঠ = Srikantha চণ্ডী = Chandi

ত = T, থ = Th

তপন = Tapan তপস্যা = Tapasya তুতুল = Tutul

সুপ্তি = Supti স্বস্তি = Swasti

আত্মদীপ = Atmadip নিত্য = Nitya সুমিত্রা = Sumitra

তথাগত = Tathagata পার্থ = Partha

দ = D, ধ = Dh

দিব্যদীপ = Dibyadip দধীচি = Dadhichi

সুধা = Sudha ধরণীধর = Dharanidhar

দ্বারকা = Dwaraka শুদ্ধ = Suddha ধ্রুব = Dhruba

ন = N

ননী = Nani   অনিল = Anil
অনন্ত = Ananta   পান্থ = Pantha
বন্দনা = Bandana   সন্ধ্যা = Sandhya   অন্নদা = Annada

প = P, ফ = Ph

পাপু = Papu   অপর্ণা = Aparna
প্রাণ = Pran   বিপ্লব = Biplab   ঈপ্সিতা = Ipsita
বাপ্পা = Bappa   পম্পা = Pampa   অর্পিতা = Arpita

ফ সর্বদা ph [কদাপি f নহে]।

ফ-এর বর্ণান্তরে বড় বেশী ভুল দেখা যায়। হিন্দু নামে কদাচ f চলিবে না, সব সময়ে লিখিতে হইবে **ph**। এই বর্ণটি-সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার।

ফণীন্দ্র = Phanindra   প্রফুল্ল = Praphulla   ফটিক = Phatik
ফাল্গুনী = Phalguni   ফুলরাণী = Phulrani   ফুল্লরা = Phullara

'ফকির' শব্দটি আরবী, এই ফ-এর ধ্বনিও f-এর মতোই বটে, কিন্তু ফকির হিন্দু নাম হইলে ph দিয়াই বর্ণান্তর করিতে হইবে—

ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় = Phakirdas Bandyopadhyay।

ব = B, ভ = Bh

বুদ্ধ = Buddha   সুখবোধ = Sukhabodh
দেবেন্দ্র = Debendra   শিবপ্রিয় = Sibapriya

'বুদ্ধ, বোধ' শব্দদ্বয়ে বর্গ্য-ব; 'দেবেন্দ্র, শিবপ্রিয়' শব্দদ্বয়ে অন্তঃস্থ-ব। সর্বভারতীয় রীতিতে অন্তঃস্থ-ব'এর বর্ণান্তরে v ব্যবহার করা হয়; যথা Devendra, Sivapriya। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানে বর্গ্য ও অন্তঃস্থ উভয় ব'তেই **b** প্রয়োগ করিতে হইবে।

ভ্রান্তি আসা সম্ভব— তাহা হইলে Vidyasagar,

Vivekananda লেখা হয় কেন। মনে রাখিতে হইবে 'বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ' কোন ব্যক্তির নাম নহে, দুইটি শব্দই সংস্কৃত উপাধি। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপাধি 'বিদ্যাসাগর'। নরেন্দ্রনাথ দত্ত হইয়াছেন স্বামী 'বিবেকানন্দ'। কিন্তু বিবেকানন্দ যদি কোন বাঙ্গালীর নাম হয়, বর্ণান্তর হইবে Bibekananda। বাঙ্গালী মেয়ের নাম যদি হয় 'বিদ্যাবতী', বানান হইবে Bidyabati।

গোবিন্দ, ত্রিবেদী, ত্রিদিব, বাসুদেব = Gobinda, Tribedi, Tridib, Basudeb।

ভগবান্, ভগবতী, ভবানী = Bhagaban, Bhagabati, Bhabani। (এই শ্রেণীর বাঙ্গালী নামে -wan, -van, -wati, -vati, -wani, -vani লিখিতে হইবে না।)

ব-ফলা = w

ব-ফলায় অনেকে v ব্যবহার করেন, যেমন 'অদ্বৈত'কে লেখা হয় Advaita, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানে ব-ফলায় **w** বসাইতে হইবে—

অদ্বৈত = Adwaita কাশীশ্বর = Kasiswar বিশ্বদীপ = Biswadip
স্বাগতা = Swagata সরস্বতী = Saraswati বিল্ব = Bilwa।

ভ = bh [কদাপি v নহে, সাবধান]।

ভ-এর বর্ণান্তরে v ব্যবহার বড়ই বিসদৃশ, বড়ই লজ্জার। এই বিশ্রী ভুল কখনও না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে—

ভক্তি, ভানু, অভী = Bhakti, Bhanu, Abhi।

অমিতাভ, অরুণাভ, অনলাভ = Amitabha, Arunabha, Analabha।

ভাস্কর, ভাস্বর, ভাস্বতী = Bhaskar, Bhaswar, Bhaswati।

অভ্র, ভুবন, ভূতনাথ = Abhra, Bhuban, Bhutnath।

আভা, প্রভা, বিভা, নিভা, শুভা, শোভা = Abha, Prabha, Bibha, Nibha, Subha, Sobha।

ম = M

মমতা = Mamata

নির্মল = Nirmal   মৃন্ময় = Mrinmay   অমৃত = Amrita

চম্পা = Champa   অম্বিকা = Ambika   অম্লান = Amlan

য = J, Y

অন্তঃস্থ-য'এর বর্ণান্তরে সর্বভারতীয় প্রয়োগ y, কিন্তু এক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ সুস্পষ্ট নহে। নামের প্রথম অক্ষর য হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান J—

যদু = Jadu   যতীন্দ্র = Jatindra   যশোদা = Jasoda

যোগীন্দ্র = Jogindra   যমুনা = Jamuna   যূথিকা = Juthika

কিন্তু মধ্যের অক্ষর য হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণান্তর-পদ্ধতিতে সামঞ্জস্য নাই—সরযূ, দুর্য্যোধন = Saraju, Durjyodhan ; কিন্তু সূর্য্য আচার্য্য = Suryya Acharyya বা সূর্য আচার্য = Surya Acharya।

য-ফলায় সর্বত্র Y

সত্য = Satya   বৈদ্য = Baidya   অমূল্য = Amulya

বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় = Bandyopadhyay, Mukhopadhyay, Chattopadhyay, Gangopadhyay।

উপাধ্যায়-যুক্ত পদবীগুলির বানানে, বিশেষতঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতে, অসতর্ক লেখকেরা প্রায়ই ভুল করে, এদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

র = R, ল = L

রবি = Rabi

রিঙ্কু = Rinku   ব্রততী = Bratati   প্রার্থনা = Prarthana

ললনা = Lalana

লাবণ্য = Labanya   শুক্লা = Sukla   কল্পনা = Kalpana

শ, স = S ; ষ = Sh

শ ষ স বর্ণসমূহের বর্ণান্তরে বেশ বিভ্রান্তি আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ—

শ = s, ষ = sh, স = s

কিন্তু সর্বভারতীয় রীতিতে শ লেখা হয় sh দিয়া। এই দুই রীতি বর্তমান থাকাতে সংশয় অনিবার্য। শ'এর ব্যবহারে শিক্ষিত লোকের লেখাতেও বানান-সাম্য দেখা যায় না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত বাঙ্গালী হিন্দুর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান উপেক্ষা করা কখনও সঙ্গত নহে ; কারণ, সার্টিফিকেটে বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দিষ্ট বানানই দেওয়া থাকে ; এই রীতি লঙ্ঘন করিলে বিষয়-কর্মে পদে পদে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা।

শ্রী, শ্যাম, শঙ্কর, শান্তিনিকেতন সর্বভারতীয় বর্ণান্তরে Shri, Shyam, Shankar, Shantiniketan বটে, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানে এইসব শব্দে S ব্যবহার করিতে হইবে— Sri, Syam, Sankar, Santiniketan।

শশী, শিশির, শৈলেশ, শ্রীশ = Sasi, Sisir, Sailes, Sris।

ঘোষ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, ষষ্ঠী = Ghosh, Bishnu, Krishna, Shashthi।

সখা, সাহা, সুবাস, সৌদামিনী = Sakha, Saha, Subas, Saudamini।

অশেষ, আশুতোষ, শীর্ষা, শ্রেষ্ঠী = Asesh, Asutosh, Sirsha, Sreshthi।

সতীশ, সুরেশ, সুশীল, সুশোভন = Satis, Sures, Susil, Susobhan।

সুভাষ, সুষমা, সুষেণ, সৃষ্টি = Subhash, Sushama, Sushen, Srishti।

সুশিষ্য = Susishya।

কিন্তু খেয়াল রাখিতে হইবে, ইংরেজী নামের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে Sh = শ, S = স ; যথা—

Shakespeare, Shelley = শেক্‌স্‌পিয়ার, শেলি।

Keats, Tennyson = কীট্‌স্‌, টেনিসন।

হ্ = H

—— হরি = Hari স্নেহ = Sneha

শাহানা, হীরালাল, হেরম্ব = Sahana, Hiralal, Heramba।

হৃদয়, হৃষীকেশ, সুহৃৎ = Hriday, Hrishikes, Suhrit।

বহ্নি, ব্রহ্ম, প্রহ্লাদ = Bahni, Brahma, Prahlad।

ক্ষ = Ksh

ক্ষমা = Kshama বিরূপাক্ষ = Birupaksha

ক্ষিতীশ, ক্ষেত্র, ক্ষৌণীশ = Kshitis, Kshetra, Kshaunis।

লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, ইক্ষ্বাকু = Lakshman, Lakshmi, Ikshwaku।

ং = N

অনুস্বার সর্বদা n দিয়া লিখিতে হইবে (কদাপি ng নহে)।

হংস, কংস, সিংহ, বংশী = Hansa, Kansa, Sinha, Bansi।

সুধাংশু, হিমাংশু, প্রেমাংশু, অংশুমান্ = Sudhansu, Himansu, Premansu, Ansuman। (Singha, Sudhangsu, Himangsu পরিত্যাজ্য।)

ঃ = H

দুঃখহরণ = Duhkhaharan। জ্যোতিঃপ্রকাশ = Jyotihprakas।

ঁ = N

চাঁদ, দাঁ, পাঁচু, বাঁশী = Chand, Dan, Panchu, Bansi।

লক্ষণীয়—পঞ্চু পাঁচু, বংশী বাঁশী শ্রেণীর শব্দে বানান-ভেদ নাই।

য়=Y

নারায়ণ=Narayan গায়ত্রী=Gayatri

আশ্রয়, জ্যোতির্ময়, মৃত্যুঞ্জয়, গুরুসদয়=Asray, Jyotirmay, Mrityunjay, Gurusaday।

টিয়া, পিয়া, কেয়া, মায়া=Tiya, Piya, Keya, Maya।

চিন্ময়ী, হিরণ্ময়ী, দয়াময়ী, সুধাময়ী=Chinmayi, Hiranmayi, Dayamayi, Sudhamayi।

জ্ঞ=Jn

জ্ঞান=Jnan (কদাপি Gyan নহে)।

জ্ঞানদা, জ্ঞানপ্রিয়=Jnanada, Jnanapriya।

যজ্ঞেশ্বর=Jajneswar।

প্রজ্ঞা, সংজ্ঞা=Prajna, Sanjna।

ড়=R

তড়িৎ=Tarit। চূড়ামণি=Churamani।

ভাদুড়ী, লাহিড়ী=Bhaduri, Lahiri।

দুকড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি=Dukari, Satkari, Nakari

দিনের কর্ম ডুবেছে মোর
আপন অতলে।
সন্ধ্যাবেলার পূজা যেন
যায় না বিফলে॥

(রবীন্দ্রনাথ)